ফররুখ আহমদ

ইকবালের নির্বাচিত কবিতা

ইকবালের নির্বাচিত কবিতা
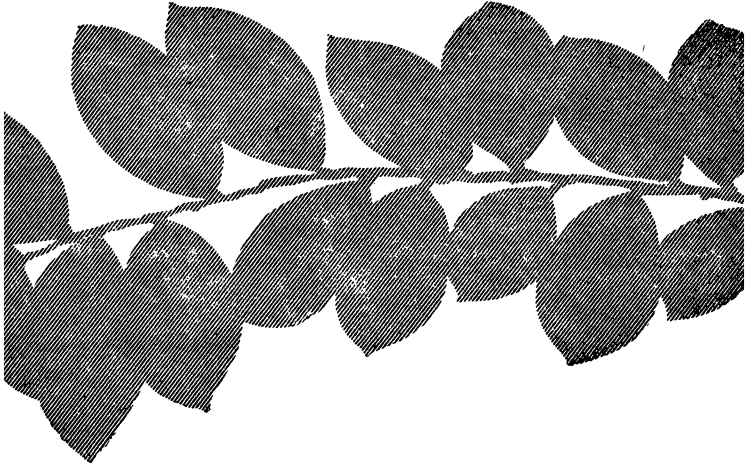
ফররুখ আহমদ

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রাজশাহী
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ইকবালের নির্বাচিত কবিতা/ফররুখ আহমদ
ইসাকেরা প্রকাশনা ৭ ইফা প্রকাশনা ২৭৬
প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭, রজব ১৪00, জুন ১৯৮০
প্রকাশক মাসুদ আলী, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জায় আবদুর রউফ সরকার
মুদ্রণে মনোরম মুদ্রায়ণ ২৪, শ্রীশদাস লেন, ঢাকা
মূল্য দশ টাকা
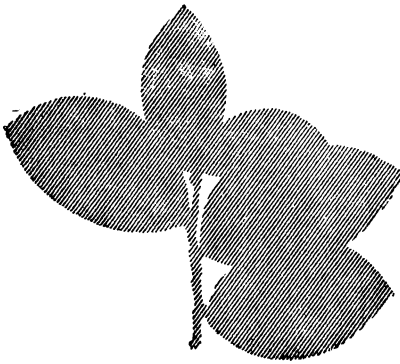
IQBALER NIRBACHITA KOBITA
The Selected Poems of Iqbal Translated and compiled by Farrukh Ahmed Published by Islamic Cultural Centre Rajshahi
Price TAKA TEN
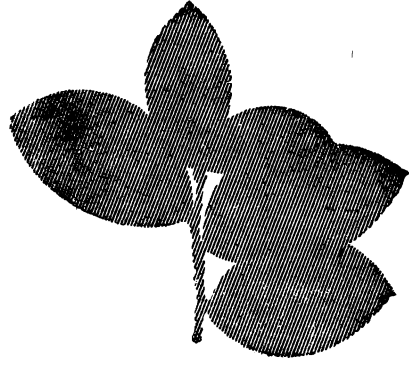
প্রকাশকের কথা

বিশ্ব সাহিত্যের বরেণ্য কবি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের রূপকার মহৎ মানবতাবাদী আল্লামা ইকবালের কয়েকটি কবিতা নির্বাচন ও অনুবাদ করেছিলেন ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ যিনি নিজে তাঁর জীবন ও কর্মে ইসলামকে অনুশীলন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন আন্তরিকভাবে—এ যেনো এক প্রদীপের আলোকে অন্য এক প্রদীপ আলোকিত হবার মতো দুর্লভ ঘটনা।

আমরা কবি ফররুখ আহমদ-এর নির্বাচিত ইকবালের কবিতা প্রকাশ করতে পেরে শুকরিয়া জানাচ্ছি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে।

মাসুদ আলী
আবাসিক পরিচালক
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
রাজশাহী

সূচীপত্র

ভূমিকা

একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-কবি হিসাবে আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত ; তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের রূপকার, মহৎ মানবতাবাদী কবি হিসাবে স্বদেশে-বিদেশে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর রচনার অন্তর্গত বাণীর আবেদন ছাড়াও রূপের ঐশ্বর্য এবং শিল্প-সাফল্যও ইকবালকে এই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেয়। স্বদেশের বিভিন্ন ভাষায় যেমন তেমনি আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায়ও ইকবালের কবিতার, কাব্যগ্রন্থের এবং দার্শনিক-চিন্তামূলক প্রবন্ধাদির অনুবাদ হয়েছে।[১] এই অনুবাদের তালিকা যেমন দীর্ঘ, অনুবাদকের সংখ্যাও তেমনি স্বল্প নয়। ইকবালের কাব্য ও অন্যান্য রচনার অনুবাদকদের মধ্যে রয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক, সুপণ্ডিত এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় ইকবাল-কাব্যের ও তাঁর অন্যান্য রচনার অনুবাদ শুরু হয় চলতি শতকের দ্বিতীয় দশকের দিকেই। গত প্রায় অর্ধ শতকেরও অধিককাল ধরে বাংলা-ভাষায়ও ইকবালের কাব্যগ্রন্থ, কবিতা ও গদ্যরচনার বহু অনুবাদ হয়েছে। তাঁর অনেক বিখ্যাত কাব্য এবং কবিতার অনুসরণে ও অনুকরণে বাংলা-ভাষায় রচিত হয়েছে কিছু কিছু কবিতা ও কাব্য। উপজীব্য আহরণে যেমন, রচনার আঙ্গিক ও রূপরীতি অনুসরণ এবং উপমা, চিত্রকল্প, রূপক ইত্যাদি ব্যবহারেও তেমনি ইকবালের প্রভাব বর্তেছে অনেক বাঙালী কবির

---

(১) ইকবালের কবিতাসমূহ দুনিয়ার বহু ভাষায় প্রধানতঃ ইংরেজী, জার্মান, ইতালীয় ও রুশ ভাষায় তর্জমা করা হয়েছে। তাঁর কবিতার কতিপয় তর্জমা বেরিয়েছে ফরাসী, তুর্কী ও আরবী ভাষায়। তাঁর বেশীর ভাগ রচনা উর্দু ও ফারসী ভাষায় লেখা। বহু সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর ফারসী কবিতা সংগ্রহ কেবল সংখ্যায় নয়, বরং গুণের দিক দিয়েও তাঁর রচনাবলীর শ্রেষ্ঠ অংশ ব'লে বিবেচিত হবার দাবী রাখে। (ইকবাল : বিশ্বজনীনতার কবি, ডক্টর এম, ডি, তাসীর, এম.এ,পি.এইচ, ডি (ক্যান্টাব), অনুবাদঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান, ইকবাল মানস. পৃঃ ৫৩)

ওপর। ফররুখ আহমদের কোনো কোনো কবিতায়ও এর স্বাক্ষর আছে। ইকবাল-কাব্যের একনিষ্ঠ পাঠক, তাঁর কবিতা ও গদ্যরচনার অনুরাগী, আদর্শের অনুসারী এবং ইকবালের বহুসংখ্যক কবিতার অনুবাদক হিসাবে ফররুখ আহমদের ওপর এই প্রভাব ছিল খুবই স্বাভাবিক।

মনে রাখা দরকার যে, ইকবাল-কাব্য অনুবাদে বাঙালী মুসলমান লেখকদের আত্মনিয়োগের মূলে সাহিত্য-শিল্পগত কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যগত কারণও ছিল। ইকবালের কবিতা ও অন্যান্য রচনার সাথে বাঙালী মুসলমান লেখকদের পরিচয় ঘটে এমন এক সময়ে যখন উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণ-আন্দোলন জোরদার হয়েছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামও ব্যাপ্তি লাভ করেছে; পরবর্তীকালে 'রেনেসাঁ-আন্দোলনের' পটভূমিতে ইকবালের রচনা ও তাঁর চিন্তাধারা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও অনুপ্রেরণা জোগায় এবং উৎসে পরিণত হয়। উর্দু, ফারসী, ইংরেজী—এই তিন ভাষায়ই ইকবাল কাব্য রচনা করেছেন, যদিও তাঁর দার্শনিক রচনাবলী প্রধানতঃ ইংরেজীতেই লেখা। তবে অনেকের মতে, ফারসী ভাষায় রচিত ইকবালের কবিতাবলীই উৎকৃষ্টতর। এর মূলে ফারসী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব এবং কাব্য-ঐতিহ্য কতটা কাজ করেছে তা বিশেষজ্ঞরাই ভালো বলতে পারবেন। যেহেতু ফারসী ইরান ছাড়াও সন্নিহিত অঞ্চলের জনগণের ভাষা এবং এই উপমহাদেশে এককালে রাষ্ট্রভাষা ছিল, ফারসী জানা লোকের সংখ্যাও কম নয়, সে কারণেও সম্ভবতঃ ইকবাল ফারসী ভাষায় কাব্য রচনা করে থাকবেন। হয়তো কবির মনে এই বাসনাও সংগোপন ছিল যে, তাঁর বাণী ও কাব্য-শিল্পের আবেদন আন্তর্জাতিক দুনিয়ায়ও ছড়িয়ে পড়ুক।

ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম রেনেসাঁর রূপকার এবং স্বদেশ ও স্বজাতির নবজাগরণের বাণীবাহক হলেও ইকবাল ছিলেন মূলতঃ মানবতাবাদী কবি, তাঁর বাণী এবং কাব্য-শিল্পের আবেদনও তাই বিশ্বমানবতার কাছেই। ইকবাল-সাহিত্যের এই বিশ্বজনীন আবেদনের জন্যে তো বটেই, উপরন্তু, মুসলিম নবজাগরণ এবং ইসলামী আদর্শের বাণীবাহক বলেও, এই মহাকবির রচনা এ দেশের বিদ্বজ্জনমহলে

এবং পাঠক-মনেও ব্যাপকতর ও গভীরতম আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। উর্দু ও ফারসী ভাষায় রচিত ইকবালের কাব্যকবিতার মূলের সাথে পরিচয়ের সুযোগ সীমিতসংখ্যক লোকেরই ঘটেছে বটে, তবে অনুবাদেও তাঁর রচনার আবেদন কম ব্যাপ্তি লাভ করেনি। এর একটা প্রধান কারণ, বাংলা-ভাষায় যাঁরা ইকবালের কাব্য-কবিতার অনুবাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রতিভাবান ও খ্যাতিমান কবি। কাজী নজরুল ইসলাম ইকবালের কোনো রচনা অনুবাদ করেননি বটে, তবে প্রাচ্যের এই মহাকবির রচনার সাথে যে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, সে কথা মুহম্মদ সুলতান অনূদিত ইকবালের 'শেকোয়া ও জওয়াবে শেকোয়া' কাব্যগ্রন্থের 'ভূমিকা' পাঠেই বোঝা যায়। তাতে নজরুল এই অনুবাদ মূলের সাথে মিলিয়ে পড়েছেন বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন।

ফারসী কাব্যের সুদক্ষ অনুবাদক, বাংলায় হাফেজ ও ওমর খৈয়ামের রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষান্তরকারী নজরুলের কাছ থেকে আমরা ইকবালের কোনো অনুবাদ পাইনি বটে, তবে তাঁর পূর্বসূরী-উত্তরসূরী অনেক খ্যাতিমান কবিই ইকবাল-কাব্যের অনুবাদে তাঁদের শ্রম ও অভিনিবেশ নিয়োজিত করেছেন, দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গত অর্ধশতকেরও অধিককালের পরিধিতে যাঁরা ইকবাল-কাব্যের অনুবাদে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে কবি শাহাদাৎ হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, অমিয় চক্রবর্তী, আবদুল কাদির, মহীউদ্দিন, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, তালিম হোসেন, আবুল কালাম মুস্তফা, মনিরউদ্দিন ইউসুফ, আবদুল হাফিজ, মুনীর চৌধুরী, আবদুর রশীদ খান, মুফাখখারুল ইসলাম, নেয়ামাল বাসির প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইকবাল-কাব্যের অনুবাদের পটভূমি এবং এক্ষেত্রে পূর্ব-সূরীদের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন :

> "বাংলাতে তাঁর (ইকবালের) প্রথম অনূদিত গ্রন্থ 'শেকোয়া'। যে-সময় বাঙালী মুসলমান নজরুল ইসলামকে পুরোভাগে রেখে আপন দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি খুঁজছে, স্বস্তিহীন মুহূর্তে সে আল্লাহ্র বিরুদ্ধেও

অভিযোগ এনেছে, তখন ইকবালের ‘শেকোয়ায়’ সে আপন মনের অনুরণন শুনেছিলো। চরম দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট, দুঃখে জর্জরিত এবং তৎহেতু আত্মঘাতী কবি আশরাফ আলী খান ‘শেকোয়া’র প্রথম তর্জমা করেছিলেন। আশ্চর্য আবেগ এবং গতির মধ্যে আশরাফ আলী ‘শেকোয়া’য় আপন মনের প্রতিফলন দেখেছিলেন, তাই তাঁর অনুবাদ আক্ষরিক না হলেও, আন্তরিকতায় উজ্জ্বল এবং কাব্য-সৌন্দর্যে নবোদিত সূর্যের বর্ণবৈচিত্র্যের মতো। এরপর ‘শেকোয়া’র তর্জমা অনেক হয়েছে—মুহম্মদ সুলতান, মীজানুর রহমান, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—এ তিনজনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২]

‘আসরারে খুদী’র প্রথম বাংলা তর্জমা করেন সৈয়দ আবদুল মান্নান। অনুবাদটি জনপ্রিয়ও হয়েছে। আবদুল মান্নান গদ্যে তর্জমা করেছেন। এরপর আমি সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত কাব্যানুবাদ করেছিলাম। আমি মূলকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিনি, শুধু মূলীভূত তত্ত্ব এবং আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছি। ফররুখ আহমদও কাব্যে অংশ-বিশেষ অনুবাদ করেছেন।”

ফররুখ আহমদ অনূদিত ‘ইকবালের কবিতা’ সম্পর্কে আলোকপাত এবং এই অনুবাদকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে স্বভাবতই কিছুটা ইতিহাস এবং উপরোক্ত পটভূমিকার দিকে ফিরে তাকাতে হয়। মূল লেখক ও অনুবাদকের অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা, সাহিত্যে—বিশেষ করে কাব্যক্ষেত্রে তাঁদের অসামান্য অবদান, চিন্তাধারা ও জীবনাদর্শের দিক থেকে উভয়ের মিল ও মানস-সাযুজ্য এবং সর্বোপরি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের নবরূপায়ণে, আর স্বদেশ ও স্বজাতির নবজাগরণে তাঁদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা ও অবদানই এটুকু দাবী করে।

বিভাগ-পূর্বকালেই ফররুখ আহমদ ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। চল্লিশের দশকে ‘রেনেসাঁ-আন্দোলনের’ পটভূমিতেই ইকবালের কবিতা ও তাঁর দার্শনিক-চিন্তাধারার সাথে ফররুখ আহমদের ব্যাপক পরিচয় ঘটে। সে-সময়েই তিনি ইকবাল-কাব্যের

(২) ইকবালের কবিতা, ভূমিকা দ্রষ্টব্য, প্রকাশক: প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ১৯৫২

॥ চার ॥

অনুবাদে আত্মনিবেদিত হন এবং ইকবাল সম্পর্কে প্রবন্ধও লেখেন একই সময়ে। তাঁর সমসাময়িক ও সহযাত্রী অনেক কবিও ইকবাল-কাব্যের অনুবাদে, ইকবাল-সাহিত্যের মূল্যায়ণে ব্রতী হন। ইকবাল-কাব্যের সাথে পরিচয় ও তাঁর কাব্যানুবাদের এই পটভূমি বিশ্লেষণ করে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন:

"নজরুল ইসলামকে পুরোভাগে রেখে বাঙ্গালী মুসলমান যখন জীবনের ভিত্তিহীনতার জন্য অভিযোগ তুলছে, তখন ইকবালের 'শেকোয়া'র সঙ্গে আমাদের পরিচয়। নজরুলকে পথিকৃৎ মেনে আশরাফ আলী খান আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন আমাদের জীবনের বিপর্যয় ও স্বস্তিহীনতার জন্য এবং সত্যাদর্শের অভাবের জন্যও। 'শেকোয়া'য় তিনি আপন মনের অনুরণন শুনলেন। কাব্য হিসেবে 'শেকোয়া'র মূল্য যতই লঘু হোক না কেন, এর অভিযোগ আমাদের অনুভূতিতে শিহরণ তুলেছিলো। নজরুলকে ভালো লেগেছিলো, ইকবালকে আরও ভালো লাগলো। নজরুলের দীপ্তি অসাধারণ, কিন্তু সেই দীপ্তির দাহন আছে—স্নিগ্ধতা নেই; ইকবালের কাব্যে জ্বালা আছে কিন্তু ধর্মের স্থির সত্যের সঙ্গে তার অসদ্ভাব নেই, তাই তা' মূলতঃ প্রশান্ত এবং জীবনানুভূতিতে অতুলনীয়।

এরপর যখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় হিন্দু থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে ভারতীয় মুসলমানকে অন্য এক জাতীয় ঐক্যতত্ত্বের সন্ধান করতে বললেন, তখন তাঁকে আমরা নেতৃপদ দিলাম।...পাকিস্তান পরিকল্পনার উন্মেষ হলো এভাবেই। রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনা নয়, কিন্তু আদর্শের স্বীকার। সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা শুনা যেতে লাগলো আরও পরে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের পর। বলা হলো প্রকাশ্যেই যে, আমাদের সাহিত্য হবে আলাদা, কেননা, আমাদের জীবনবোধ হিন্দুদের সঙ্গে সংসক্ত নয়। কবিতার ক্ষেত্রেই এ আদর্শের অনুসৃতি হলো সার্থক। পাকিস্তান তখনও পর্যন্ত আবেগ, উল্লাস ও কল্পনার এবং কবিতাই হল এ আবেগ প্রকাশের একমাত্র পরিসর। এ বক্তব্যের সঙ্গে রূপকল্পের সমন্বয় সাধনের পর কখনও কখনও কারো কবিতা শ্রোত্ররসায়নও হয়েছে। কিছুটা অগভীরভাবে হলেও,

কাব্যক্ষেত্রে তিনটি ধারার চিহ্ন দেখা গেলো—ইসলামী ঐতিহ্যের কাহিনী ও সৌন্দর্যের ধারা ; ইসলামের সত্য বিশ্বাস এবং উপলব্ধিগত আদর্শ জীবনবোধ এবং সর্বশেষে পুঁথি-সাহিত্য ও পল্লীগীতির রূপ এবং কল্পনার জীবন। ইকবালের প্রভাব কার্যকরী হয়েছিলো প্রথম দু'টি ক্ষেত্রে। ইকবালের প্রভাবে এ দু'টি ধারা বলিষ্ঠ হয়েছিলো এবং নতুন রূপ নিয়েছিলো—ক্ষীণ প্রাণধারা স্রোতাবেগ পেয়েছিলো।" (ইকবালের কবিতা, ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতার সমর্থন মিলবে সে-সময়ে লেখা ফররুখ আহমদের ও তাঁর সমসাময়িক ও সহযাত্রী কবিদের অনেকের রচনায়। বলেছি, ফররুখ আহমদ যেমন ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ করেছেন, তেমনি এই মহাকবির কোনো-কোনো কবিতা অবলম্বনে লিখেছেন নতুন কবিতা। প্রসঙ্গতঃ তাঁর 'জওয়াব-ই-শেকোয়া'র অনুকরণে 'জওয়াব' শীর্ষক কবিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। কাব্য-সাধনার প্রাথমিক-পর্বেই ফররুখ আহমদ তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন :

এ আকাশ মুছে যাক এ আকাশে এসেছে জীর্ণতা।

তিনি আরও বলেছেন :

তবে মুখ ঢাকো আজ হায় বন্ধ্যা আচ্ছন্ন সবিতা
দীপ্ত দিন তুলে ধরো আঁধারের কালো যবনিকা।
[নাটক]

মনে হয়, প্রাচ্যের দার্শনিক মহাকবি আল্লামা ইকবালের কবিতার সঙ্গে ফররুখ আহমদের অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর কাব্যসাধনার প্রাথমিক পর্বেই ঘটে গিয়েছিলো। ফররুখ আহমদ-অনূদিত ইকবালের একটি কবিতায় আছে ; 'এ আকাশ জরাজীর্ণ এইসব তারারা পুরান/আমি চাই সদ্যজাত পৃথিবী নতুন।' ইকবালের মতো দার্শনিকমনের অধিকারী না হলেও, কাব্যক্ষেত্রে প্রাচ্যের এই মহাকবির আদর্শের অনুবর্তিতা ফররুখ আহমদের রচনায় বিশেষভাবেই দৃষ্টিগ্রাহ্য। ১৯৪৫ সালেই কাজী আবদুল ওদুদ ফররুখ-কাব্যের এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে লিখেছিলেন : "বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য সাহিত্যিক তারা অবশ্য প্রধানতঃ বুদ্ধির মুক্তিবাদী। তবে মোটের ওপর নিঃসঙ্গ

সাহিত্যিক। আত্মনিয়ন্ত্রণী দলের সাহিত্যিক ও সাহিত্যোৎসাহীদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হয়েছেন ফররুখ আহমদ। তিনি ইকবালের অনুবর্তী হতে চেষ্টা করেছেন, যদিও ইকবালের দার্শনিক মেজাজ তাঁর নয়। তিনি তরুণ, বিচার-বিশ্লেষণ নয়, সুপরিণতিই তাঁর জন্য আজ কাম্য।"

পরবর্তীকালে, ইকবালের কবিতা অনুবাদে আত্মনিয়োগের ফলে এই আদর্শ-অনুবর্তিতা এবং অনুসরণ আরও স্পষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য, বিভাগ-পূর্বকালে তো বটেই, (সাবেক) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও গত দুই-আড়াই দশকে ফররুখ আহমদ ইকবালের বহুসংখ্যক কবিতা অনুবাদ করেন। সে-সব কবিতার মধ্যে রয়েছে—তাঁর পূর্বসূরী ও সমসাময়িক কবিদের অনূদিত কবিতা ছাড়াও, ইকবালের অনেক কবিতা—যা' ইতি-পূর্বে অনূদিত হয়নি। কিন্তু বহুসংখ্যক কবিতা অনুবাদ করা সত্ত্বেও, এই দীর্ঘ সময়ের পরিধিতেও, ফররুখ আহমদ-অনূদিত ইকবালের কবিতা আলাদাভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত ও সৈয়দ আলী আহসান-সম্পাদিত 'ইকবালের কবিতা' সংকলনে স্থান পায় ফররুখ আহমদ-অনূদিত ইকবালের ১২টি কবিতা। বাকী কবিতা-গুলির অনুবাদক সৈয়দ আলী আহসান ও আবুল হোসেন। এ-প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন,

> "বর্তমান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও আমার তর্জমা।...অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ আমাদের অবলম্বন ছিলো ইকবালের কবিতার ইংরেজী তর্জমা। 'আসরারে খুদী' ছাড়া অন্যান্য কবিতার ক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়েছে। যাতে ভাষান্তর মূলের সঙ্গে যথাযথ থাকে।
>
> ফররুখ আহমদের 'পূর্বাণী', 'বুআলী কলন্দর' ও 'ভিক্ষা' 'আসরারে খুদী'র তিনটি অধ্যায়ের তর্জমা—প্রথমটি অংশবিশেষ, পরের দুটি সম্পূর্ণ। অনুবাদের জন্য ফররুখ আহমদের অবলম্বন ছিলো নিকলসন-কৃত 'আসরারে খুদী'র ইংরাজী তর্জমা।" (ঐ)

পরবর্তীকালে, ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান পাবলিকেশান্স-প্রকাশিত 'ইকবাল-চয়নিকা' সংকলন-গ্রন্থেও ফররুখ আহমদ-অনূদিত অনেকগুলি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়।

॥ সাত ॥

'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা'ই ফররুখ আহমদ-অনূদিত কবিতার প্রথম গ্রন্থ। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থের অন্তর্গত ইকবালের কবিতাবলী ইতিপূর্বে আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ফররুখ-রচনাবলী'তেও স্থান পেয়েছে। এসব অনূদিত কবিতায় ফররুখ আহমদ মূলের সাথে কতটা সঙ্গতি রক্ষা করতে পেরেছেন, ভাষান্তরে দিতে পেরেছেন কতটা দক্ষতা ও সাফল্যের পরিচয়, তা বিচার করতে হলে, অনুবাদের নিয়ম-কানুন, কায়দা-কৌশল এবং শিল্পরূপের নিরিখেই তা যাচাই করতে হবে। মনে রাখা দরকার, ফররুখ আহমদ তাঁর অনুবাদকর্মে অবলম্বন করেছেন মূল রচনার ইংরেজী-অনুবাদ এবং অন্য অনুবাদকদেরও অবলম্বন হয়েছে প্রধানতঃ ইংরেজী-অনুবাদই। মূল রচনা এবং ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ছাড়াও, অন্যদের অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে তুলনামূলক বিচারেও এই অনুবাদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, অনুবাদ 'কাশ্মীরী শালের উল্টোপিঠের মতো।' সঙ্গত কারণেই, অনুবাদে মূলের সৌন্দর্যের সাক্ষাৎলাভ সবক্ষেত্রে সহজ নয়, সম্ভবও নয়। বিশেষ করে কাব্যের অনুবাদে ভাবদেহের পরিচয় মিললেও, রূপ-সৌন্দর্য এবং কাব্যের মনোহর লাবণ্যের সাক্ষাৎ সব সময় মেলে না। স্বল্পশক্তিমান অনুবাদকের হাতে পড়ে এ-কারণেই বহু মহৎ কবির কাব্যের বিপর্যয় ঘটেছে, তাঁদের সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। উৎকৃষ্ট অনুবাদের অভাবে এবং দুর্বল অনুবাদের দরুন, সমগ্র বিশ্বপটভূমিকায় রবীন্দ্র-কাব্যের মহিমা যে অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে, এ দুঃসংবাদ বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি রচনায় কয়েক বছর আগেই পরিবেশন করেছিলেন। অবশ্য অনুবাদে নবসৃষ্টিও সম্ভব। ফিটজেরাল্ড বা কান্তি ঘোষের মতো দক্ষ অনুবাদকের হাতে পড়লে অনুবাদ-কাব্য নবসৃষ্টির মহিমা পায়। ইকবালের জন্যে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, অনেক অক্ষম অনুবাদকের হাতে তাঁর কাব্যের মহিমা ও মাধুর্য লাঞ্ছিত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় যাঁরা ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ করেছেন, তাঁদের অনেকেই সৃজনক্ষমতার অভাবে এবং আক্ষরিকভাবে মূলানুগ হবার মূঢ় বাসনায় উদ্দীপিত হয়ে, ইকবাল-কাব্যের বিপর্যয় ডেকে এনেছেন। তাঁরা এ সত্য বিস্মৃত হয়েছেন যে,

অনুবাদ-অর্থ মূলের ভাষান্তর মাত্র নয়, মূল সৌন্দর্যের নবরূপায়ণও বটে। নবসৃষ্টির মহিমায় মাধুর্যময় এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে না পারলে, অনুবাদ বিপর্যয়কেই প্রশ্রয় দেয়। উল্লেখিত অনুবাদকদের কল্যাণে আমরা 'দার্শনিক' ইকবালকে পেয়েছি বটে, কিন্তু কবি ইকবালকে অনেক-ক্ষেত্রেই হারিয়েছি।[৩]

ইকবাল সম্পর্কে প্রখ্যাত উর্দু কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ বলেছেন : তাঁর দর্শন ও জীবনের অন্যান্য দিক নিয়ে যতো লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনায় তাঁর কবি-প্রতিভা ও সৃষ্টির ঐন্দ্রজালিক শক্তিমত্তা সম্পর্কে খুব কম বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হয়েছে। অথচ তাঁর বাণীর প্রাণবস্তু এবং শক্তির উৎস হচ্ছে তাঁর কবিতা। ফয়েজের লেখা থেকে জানা যায়, উর্দু কাব্যে ইকবাল অর্ধ ডজন নতুন ছন্দ প্রবর্তন করেন. প্রথম সার্থক-ভাবে নামবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করেন এবং অসংখ্য নতুন শব্দ আমদানী করেন। অপরিচিত ধ্বনি, শব্দ ও বিশেষ্য পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ইক-বালের কাব্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির কৌশল সম্পর্কে ফয়েজ বলেন : ইকবালের মতো আর কোনো কবি উর্দু কবিতায় ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের এতখানি ধ্বনি-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেননি। এ পদ্ধতির তিনিই উদ্গাতা। আর ইকবালের অন্বেষা হলো বিশ্ব-জগত ও মানুষ, বিশ্ব-জগতের মুখোমুখি মানুষ। তাঁর কবিতার শেষ কথা হলো : মানুষের কথা, মানুষের বিশ্বের কথা, মানুষের একক মর্যাদার কথা। ফয়েজের দৃষ্টিতে, এই মূল্য-বোধই ইকবালের কবিকীর্তিকে অতুলনীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

ভাব-সম্পদের মতো কাব্যের রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রেও ইকবাল নবসৃষ্টির মহিমা সঞ্চারিত করেছেন। কাব্যের টেকনিক বা আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-

---

(৩) "তাঁহার কবিতায় শিল্পী ও স্রষ্টার সম্মেলন ঘটিয়াছে, ফারসী ও উর্দু উভয় ভাষারই চোস্ত ও সুমার্জিত কবিতায় ইকবাল মিনারেট সমূহের সুদূরবর্তী ইশারা ও আরবীয় মরু বালুকার চাকচিক্যময় স্বপ্ন আমাদের চোখে জাগাইয়াছেন। জীবনের বাস্তবতার পটভূমিকায় নীলিম নিঃসীমতা যেন এখানে গলিয়া পড়িতেছে। তাঁহার রহস্যবাদ জীবনের সম্মুখীন হইয়াছে, তবু ইহা যেন রহস্যের অতলতাকে স্পর্শের জন্য ব্যাকুল। তাঁহার ভাষায়ও প্রাঞ্জল শব্দাবলী যেন অগম্য অতলতাকে প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। সুদক্ষ জহুরী যেভাবে স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তরাদি চয়ন করিয়া থাকে. ইকবালও তেমনই সতর্কতাসহকারে শব্দ চয়ন করিতেন। তবুও তাঁহার শৈল্পিক নৈপুণ্যতা ও ভারসাম্য রক্ষার অন্তরালে স্রষ্টার বাস্তবতাবোধ প্রভমান।" (ইকবাল, অমিয় চক্রবর্তী, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ্‌ বাহার সম্পাদিত 'কবি ইকবাল', বুলবুল হাউস, কলকাতা, ১৯৪১, দ্রষ্টব্য)

॥ নয় ॥

নিরীক্ষায় ইকবালের সাফল্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনি নব-উদ্ভাবিত টেক্‌নিকে কবিতার ঐন্দ্রজালিক রূপসৃষ্টিতেও তাঁর পারঙ্গমতা দুর্লভ শিল্পীজনোচিত। ইকবালের কাব্যের মূলের সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, অনুবাদের মাধ্যমেই যারা দার্শনিক-কবি ইকবালকে জানেন, তাদের পক্ষে ইকবাল-কাব্যের বিস্ময়কর শিল্পরূপ এবং অন্তঃসত্তার প্রকৃত পরিচয় লাভ অসম্ভব, কারণ, অনুবাদে মূলের ভাব ধরা দিলেও, অনেকক্ষেত্রেই এর শিল্পরূপ ধরা দেয়না; ফলে অনুবাদ পাঠের মাধ্যমে 'দার্শনিক' ইকবালকে জানা সম্ভব হলেও, কবি ইকবালকে জানা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, তাঁর শিল্পদক্ষতা থেকে যায় পাঠকের বোধের পরপারে; এর জন্যে অক্ষম অনুবাদও কম দায়ী নয়। আশার কথা এই যে, কয়েকজন প্রতিভাধর কবি ও সহমর্মী ইকবাল-কাব্যের অনুবাদে তাঁদের শ্রম ও সাধনা নিয়োজিত করার ফলে আমরা বাংলা ভাষায়ও প্রাচ্যের এই মহান দার্শনিক-কবির অনেক কবিতার চমৎকার ভাষান্তর উপহার পেয়েছি।

ফররুখ আহমদ-অনূদিত, এই গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাবলী পাঠ করলেও, ইকবাল-কাব্যের বাণীর এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে-সাথে তার সৌন্দর্য এবং লাবণ্যমহিমার সাথেও পরিচিত হওয়া যাবে। এবং অনুবাদ পাঠে স্পষ্টতঃই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে যে, ইকবাল শুধু আত্মার রহস্য-সন্ধানী এবং আত্মসত্তার উদ্বোধনকামী মহৎ দার্শনিকই নন, তিনি মহৎ কবিও। ইকবাল তাঁর জীবনাদর্শ, জীবনানুভূতি এবং স্বতন্ত্র জীবন-দর্শন ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কাব্যের ভাষা এবং আঙ্গিকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য এবং ভাবনা উৎসারিত হয়েছে গভীর উপলব্ধি ও অনুভূতি থেকে, আর এ-কারণেই প্রত্যক্ষতার বন্ধন অতিক্রম করে তা অনেকখানি রহস্যময় চারিত্র অর্জন করেছে। ইকবালের সৌন্দর্যদৃষ্টি ও অপরিমেয় কল্পনাশক্তি তাঁকে করে তুলেছে ব্যঞ্জনাময়। উপমাৎ-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ও রূপপ্রতীকের ব্যবহারের সাহায্যে ইকবাল তাঁর বক্তব্যকে দিয়েছেন সৃজনধর্মিতা, করেছেন অনিঃশেষে তাৎপর্যমণ্ডিত। ইকবাল যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প সৃষ্টি ও রূপকের ব্যবহারে অন্যান্য বিশ্ববিশ্রুত মহৎ কবিদের মতোই সুদক্ষ—এর পরিচয় আমরা ফররুখ আহমদ-অনূদিত এই গ্রন্থের কবিতাবলীতেও পাবো।

ইকবাল-কাব্যের অনুবাদে ফররুখ আহমদের দক্ষতার পরিচয় তুলনামূলক বিচারে এবং এই স্বল্পপরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়, তবুও, কয়েকটি উদাহরণ থেকেই বুঝা যাবে, ইকবালের আদর্শের অনুবর্তী, প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহমদের সৃজনীক্ষমতায়, অনুবাদও কতখানি নবসৃষ্টির মহিমা লাভ করেছে। উপমা ও রূপপ্রতীক সমৃদ্ধ একটি অনবদ্য কবিতার ভাষান্তর করেছেন ফররুখ আহমদ এইভাবে ঃ

দুরন্ত দস্যুর মত যখন প্রোজ্জ্বল সূর্য হানা দিল শর্বরীর 'পরে
আমার ক্রন্দনধারে শিশির-সিঞ্চিত হল

গোলাবের মুখ,

নার্গিসের ঘুমঘোর মুছে নিল মোর অশ্রুকণা,
উজ্জীবিত তৃণদল উল্লাসে ছড়ায়ে যায়

আমারি সে একাগ্র আবেগে।

[আসরার-ই-খুদী, সূচনা খণ্ড]

সৈয়দ আলী আহসান উপরোক্ত স্তবকেরই অনুবাদ করেছেন এই ভাবে ঃ

দিনের প্রথম সূর্য দুরন্ত আঘাতে যবে
শর্বরীর তিক্ত ক্লান্তি করিলো হরণ
অশ্রুর নীহারে কাঁপে নিষিক্ত পুষ্পের দল
রক্তিম বরণ ;
নার্গিস ফুলের তন্দ্রা মুছিয়া দিলাম আমি
অশ্রুর প্রবাহে
জাগিয়া উঠিল অনু অচেতন ছিলো যাহা
মৃত্যুর প্রদাহে।
আমার উচ্ছ্বাসে জাগে শীত-শীর্ণ কিশলয় দল।

উদ্ধৃত কবিতাংশের দু'জন অনুবাদকই আমাদের সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি, এবং অনুবাদে তাঁদের দক্ষতাও স্বয়ংপ্রকাশ; তবুও, দুটি কবিতাংশই পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লে অনুভব করা যাবে যে, ফররুখ আহমদের ভাষা, তাঁর নিজের কবিতার ভাষার মতোই, অনেক বেশী গাঢ়বদ্ধ, সংহত এবং প্রাণবান। মূলের আক্ষরিক অনুবাদ হয়তো কেউ-ই

করেননি, কেননা, সৈয়দ আলী আহসান নিজেই বলেছেন, ইংরেজী থেকে অনুবাদেও তিনি মূলকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি, শুধু মূলীভূত তত্ত্ব এবং আদর্শকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছেন। তবুও, এঁরা নিজেরা সৃজনশীল কবি বলেই, ইকবালের উপমা-চিত্রকল্পও অনেকখানি ভাষান্তরিত হয়ে এসেছে। 'দুরন্ত দস্যুর মত যখন প্রোজ্জ্বল সূর্য হানা দিল শর্বরীর 'পরে'—ফররুখ আহমদ-অনূদিত এই চিত্রকল্পটি তো অনবদ্য রূপমহিমা লাভ করেছে। তাঁর অনূদিত অন্যান্য কবিতায়ও লক্ষ্য করা যাবে যে, তিনি শুধু ইকবালের বাণীর আক্ষরিক অনুবাদ বা ভাষান্তরই করেননি, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পেরও নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন; এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, ফররুখ আহমদ নিজেও শক্তিমান এবং রূপদক্ষ কবি, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও ছিল তাঁর পারঙ্গমতা।

ফররুখ আহমদ-অনূদিত 'খোদার দুনিয়া' কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ

কে তিনি—মাটির নিবিড় আঁধারে লালন করেন বীজ?
কে তিনি—ওঠান সহজে এ মেঘ দরিয়ার ঢেউ থেকে?
কে তিনি—আনেন পশ্চিমী হাওয়া, সুফলপ্রসূ এ বায়ু?
এ জমিন কার? অথবা এ কার সূর্য-রশ্মিধারা।
মুক্তার মত ফসল করেন শস্যের শীষে জমা।
কার ইঙ্গিতে অনুভূতিময় মাসের পরিক্রমা?
শোন জমিদার—এ ক্ষেত-খামার এ তোমার নয়,
এ তোমার নয়,
এ নয় তোমার কোন সম্পদ; আমারো এ নয়
কোন সঞ্চয়॥

আবুল হোসেনের অনুবাদ ঃ

মাটির আঁধার গর্ভে লালন করে কে লক্ষ বীজ?
সমুদ্রের ঢেউ থেকে আকাশে তোলে কে কালো মেঘ?
পশ্চিম পাহাড় থেকে ডেকে আনে কে মধুর হাওয়া?
এ সোনার মাঠ কার, কার ওই সূর্যের স্বচ্ছ আলো?
মুক্তার দানায় ভরে কে সোনালী ফসলের শীষ?
মাসগুলো ঘুরে ঘুরে আসে কার অমোঘ আদেশে?

॥ বার ॥

এ জমি তোমার নয়, হে ভূস্বামী তোমার তো নয়
নয় পূর্ব-পুরুষের, তোমার আমার কারো নয়।

দু'জন কবিই অনুবাদে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এঁরা শক্তিমান ও রূপদক্ষ কবি বলেই, অনুবাদেও উপমা-চিত্রকল্প আকর্ষণীয়রূপে ভাষান্তরিত হয়েছে। অনুবাদের ভাষা ব্যবহারে আবুল হোসেন অবলম্বন করেছেন অনেকটা কথ্যরীতি এবং ঘরোয়াভঙ্গী, ফলে ছন্দ-নির্ভর এই অনুবাদও অনেকটা গদ্যের ধার ছুঁয়ে গেছে ; অন্যপক্ষে ফররুখ আহমদের ভাষা অনেকটা ক্লাসিকধর্মী, উচ্চারণ গম্ভীর এবং ছন্দও সুনিরূপিত ও বাণীবদ্ধ। ফলে কবিতাটি পাঠ বা আবৃত্তিকালে এর ধ্বনিময়তা, গাম্ভীর্য এবং গতিময়তা চেতনাকে স্পর্শ করে, হৃদয়ে অনেক বেশী আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়। 'মুক্তার দানায় ভরে কে সোনালী ফসলের শীষ ? মাসগুলো ঘুরে ঘুরে আসে কার অমোঘ আদেশে'— এই অনুবাদ হয়তো অনেকখানি মূলানুগ, কিন্তু 'মুক্তার মত ফসল করেন শস্যের শীষে জমা। কার ইঙ্গিতে অনুভূতিময় মাসের পরিক্রমা ?'—যে ভাষার ক্লাসিকধর্মিতা ও ছন্দধ্বনিময়তার কারণে অধিক আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়, তা অস্বীকার করা যাবে না।

ইকবাল-কাব্যের অন্যতম দক্ষ অনুবাদক, এবং উর্দূভাষায় অভিজ্ঞ মনির উদ্দীন ইউসুফ লিখেছেন, "ইকবালের উর্দূ ক্লাসিক্যাল উর্দূ, অর্থাৎ তাঁর ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রাধান্য ও প্রাচুর্য সুপ্রকট। Image allusion-এর জন্যই যে এ প্রাধান্য তা-ও নয় ; ভাষার গাম্ভীর্য ও বিষয়-বস্তুর ব্যাপকতা রক্ষার খাতিরেই বরং ভাষার ক্লাসিক্যাল রূপকে কবি সচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগের দিক থেকেও প্রাচীন রীতিই তাঁর কাছে বেশী উপযোগী মনে হয়েছে।" (ইকবালের কাব্য-সঞ্চয়ন, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।) ক্লাসিক্যাল ভাষা ও বাণীভঙ্গী অনুসরণ, ছন্দ ও শব্দের নিপুণ ব্যবহার এবং উপমা-চিত্রকল্প রচনায় দক্ষতার গুণে অনুবাদও কতটা মৌলিক কবিতার চারিত্র্য অর্জন করতে পারে, ফররুখ আহমদ-অনূদিত 'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা'য়ও তার পরিচয় মিলবে। 'আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন' কবিতাটিই ধরা যাক ; এর প্রথম স্তবকটি হলো :

খোল আঁখি, দেখ চেয়ে এ পৃথিবী, দেখ নভঃতল ;
দেখ এই বাষ্প আর হাওয়ার মহল।
তিমির বিদার সূর্য দেখ চেয়ে দীর্ণ করে
সুপ্ত পূর্বাচল ॥
গুণ্ঠন-বিমুক্ত স্বপ্ন সংগোপন দেখ এই উজ্জ্বল আলোতে,
বিচ্ছেদ দিনের ব্যথা, অশেষ যন্ত্রণা বহ্নি
দেখ তুমি ধরাবক্ষ হ'তে !
অধীর হ'য়োনা তবু আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে
আবর্তিত সংগ্রামের স্রোতে ॥

[ফররুখ আহমদ - অনূদিত]

এই কবিতাটির একাধিক অনুবাদ হয়েছে এবং অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকরা। কারো কারো অনুবাদ মূল থেকেই; তবুও অনুবাদগুলির পাশাপাশি সংস্থাপন এবং তুলনামূলক পাঠে এটাই স্পষ্ট হয় যে, ফররুখ আহমদের অনুবাদের মতো এতটা সংহত ও সুন্দররূপ, উপমা-চিত্রকল্পের সমবায়ে এমন প্রাণময়তা ও গতিশীলতা, আর কারো ভাবান্তরে মূর্ত হয়নি। বরং অনেকের অনুবাদে জড়তা এবং ক্লিষ্টতাই অনুভবযোগ্য। এর প্রধান কারণ, ভাষা ও ছন্দ-নির্বাচনে তাঁদের যথার্থতাবোধের অভাব, ভাষা ও ছন্দকে বাণীবহনের উপযোগী করে ব্যবহারের ক্ষমতার ন্যূনতা এবং উপমা ও চিত্রকল্পে নতুন প্রাণ-সঞ্চার করতে না পারা। এই কবিতাটির উল্লেখযোগ্য অংশের কয়েকটি অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো ঃ

মেল আঁখি হের সুন্দর
হের নভঃতল, প্রকৃতি হের ;
পূর্ব-দিগন্তে উদিত সূর্য
ক্ষণিকের লাগি তাহারে হের।
গুণ্ঠনহীন উজ্জ্বল বিভা
গুণ্ঠন ঢাকা তাহারে হের,
বিরহ যুগের যাতনা মথিত

অত্যাচারিত হৃদয় হের।

অধীর হয়োনা। দেখ কী দ্বন্দ্ব

রয়েছে আশা ও ভীতির মাঝে

[অনুবাদ : সুফিয়া কামাল]

খোল আঁখি, হের ধরা, দেখ চেয়ে গগন প্রাঙ্গণ,

কেমনে উদিছে ওই পূর্বাচলে ভাস্কর তপন!

সে নগ্ন প্রকাশ হের, যবনিকা—মাঝারে গোপন।

অত্যাচার দেখ আজ দিবারাত্র তব বিচ্ছেদের

অধীর হয়োনা বন্ধু, দ্বন্দ্ব হের আশা ও ভয়ের।

[অনুবাদ : মনির উদ্দীন ইউসুফ]

উপরোদ্ধৃত সবগুলো অনুবাদই সুন্দর এবং প্রশংসার দাবী রাখে। দুটি ছন্দোবদ্ধ এবং একটি গদ্য-ছন্দের অনুবাদের সাথে মিলিয়ে দেখলেও বুঝা যাবে যে, ফররুখ আহমদ মূল থেকে তেমন দূরে সরে যাননি, বরং মূল ভাববস্তু এবং শিল্প-সম্পদের ওপর ভিত্তি রেখেই, তাঁর সৃজনক্ষমতার স্পর্শে এই অনুবাদ কবিতাটিকেও নতুন মহিমা দিয়েছেন, এবং তাতে প্রাণসঞ্চার করেছেন। আর এ-ক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক হয়েছে ভাষা ও ছন্দের ওপর অবাধ অধিকার এবং কল্পনা-প্রতিভা। তিনি যখন উচ্চারণ করেন :

ওঠো—দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও।

ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও॥

করো ঈমানের আগুনে তপ্ত গোলামী খুন

বাজের সমুখে চটকের ভয় ভাঙিয়ে দাও।

ঐ দেখ আসে দুর্গত দীন-দুখীর রাজ :

পাপের চিহ্ন মুছে দাও, ধরা রাঙিয়ে দাও॥

কিষাণ-মজুর পায় না যে মাঠে শ্রমের ফল,

সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও।

স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কেন আড়াল?

মধ্যবর্তী মোল্লাকে আজ হাঁকিয়ে দাও........

তখন এই রচনা আদৌ অনুবাদ বলে মনেই হয় না, এটি ইকবাল কিংবা অন্য কারো কবিতা কিনা, সে-প্রশ্নও মনে জাগে না, বরং একটি

মৌলিক কবিতারূপেই পাঠকের চেতনায় আঘাত হানে, মনে অনুরণন জাগায়। অনুবাদের ক্ষেত্রে এরচেয়ে বড় সার্থকতা আর কি হতে পারে? অনেকেই এই কবিতাটির অনুবাদ করেছেন, কিন্তু ফররুখ আহমদের অনুবাদের মতো এতটা জনপ্রিয়তা আর কারো ভাষান্তরই লাভ করতে পারেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বাসে জোর না বাঁধলে বাক্যবন্ধন দৃঢ় হয় না; আদর্শবাদী ও জীবনশিল্পী কবি ইকবালের বিশ্বাস ছিল গভীর ও অনমনীয়, এবং তা-ই তাঁর কবিতায় বাক্যবন্ধনের দৃঢ়তায়, রূপে-রঙে, মনোহর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ইকবালের কাব্যাদর্শের অনুরাগী ও অনুবর্তী, ফররুখ আহমদেও বিশ্বাস ছিল সুগভীর, তিনিও ছিলেন আদর্শ-বোধে উজ্জীবিত এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী। এই প্রত্যয়ের পরিচয় তাঁর মৌলিক রচনায় যেমন, তেমনি অনুবাদেও দৃঢ় বাক্যবন্ধনের রূপে, উপমা-চিত্রকল্পের মনোহারিতায় আকর্ষণীয় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ফররুখ আহমদ-অনূদিত এই কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলেও উপলব্ধি করা যাবে যে, ইকবালের কবিতা ভাবের সঙ্গে মনোহর রূপের সমন্বয়েই মহৎ এবং মাধুর্যময়। তাঁর বিশিষ্ট জীবন-দর্শন যেমন কবিতাকে সারবান করেছে, তেমনি তাঁর ব্যাপক জীবনদৃষ্টি ও দুর্লভ সৃজনক্ষমতা দিয়েছে স্বাস্থ্য ও লাবণ্যের আভা। ইকবাল-কাব্যের সৌন্দর্য-মহিমা শুধু এর বহিরঙ্গেই বিদ্যুতের মতো ঝলসিত নয়, এর অন্তঃপ্রবাহেও বিচ্ছুরিত। ইকবাল কাব্যপাঠে—এই অনুবাদেও, পাঠক যে উপঢৌকন পাবেন, তার পরিচয় দিতে গিয়ে, ইকবাল-কাব্যের সুদক্ষ অনুবাদক, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায় বলতে হয়, "কবি ইকবালের কাব্য-কাননে বিচরণ করলে সৌরভি কুঞ্জ দেখতে পাব, খররৌদ্র ধূলিতে শ্যামল-মেলে আছে, অগণ্য মনোহর বীথি আহ্বান করে নিয়ে যায় গভীর ভাবনার নির্দেশে। বাক্যের ভঙ্গী, রসের উচ্ছল মাধুর্য এবং দিগন্ত দৃষ্টিময় ব্যঞ্জনা তাঁর বহু কবিতায় উপকর্ষের যে ভাষা পেয়েছে, তা উর্দু বা পারসিক ধ্বনিকে অতিক্রম করে সর্বমানবের চিত্তচারী।" (সাম্প্রতিক পৃঃ ১২৯)

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্

।। ষোল ।।
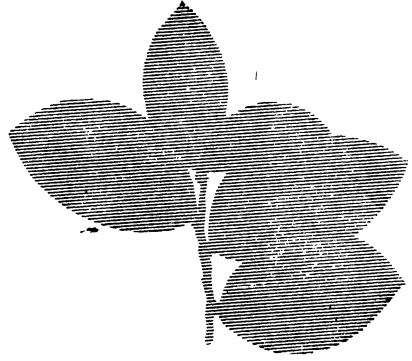
আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন

১.

খোল আঁখি, দেখ চেয়ে এ পৃথিবী, দেখ নভঃতল,
দেখ এই বাষ্প আর হাওয়ার মহল।
তিমির-বিদার সূর্য দেখ চেয়ে দীর্ণ করে সুপ্ত পূর্বাচল।

গুণ্ঠন-বিমুক্ত স্বপ্ন সংগোপন দেখ এই উজ্জ্বল আলোতে,
বিচ্ছেদ দিনের ব্যথা, অশেষ যন্ত্রণা বহ্নি দেখ তুমি ধরাবক্ষ হতে!
অধীর হ'য়োনা তবু আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে
আবর্তিত সংগ্রামের স্রোতে ।।

২.

দেখ এই ঘনঘটা, বর্ষণ মুখর মেঘ
দেখ এই অবিশ্রান্ত শ্রাবণী বাদল,
আকাশের এ গম্বুজ,—শব্দহীন আবহমণ্ডল,
এ পাহাড়, এ সমুদ্র, বালিয়াড়ি—এই মরুতল,
নিয়ন্ত্রিত হবে এরা তোমারি শাসনে!
কাল তুমি দেখিয়াছো উজ্জ্বল ফেরেশতাদল জান্নাত কাননে ;
দেখ নিজ প্রতিকৃতি আজ তুমি সময়ের এ স্বচ্ছ দর্পণে ।।
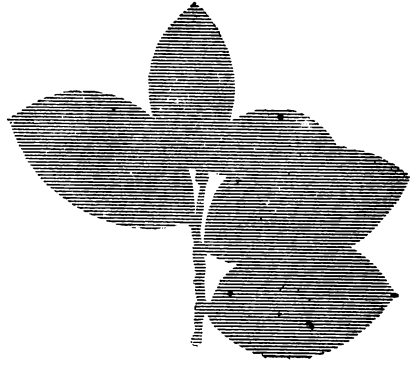
৩.

তোমার পলকপাত বুঝে নেবে অনায়াসে অনন্ত সময়,
দূরান্ত আকাশ থেকে তারা-রা তোমাকে দেখে
প্রতিক্ষণে মানিবে বিস্ময় ।
প্রজ্ঞার বারিধি তব মানিবে না কোন দিন কোন সীমারেখা,
নভের উচ্চতা ছুঁয়ে চিত্তের স্ফুলিঙ্গ তব দূরে দেবে দেখা,
গ'ড়ে তোল নিজ সত্তা আকাঙ্ক্ষার শেষ প্রান্তে
তারপর দেখ চেয়ে একা ।।

৪.

যে সূর্যে প্রদীপ্ত বিশ্ব,—সে তোমার স্ফুলিঙ্গ দহন,
তোমার শিল্পের মাঝে সম্মোহিত আছে এক
সুসম্পূর্ণ পৃথিবী নূতন !
অর্জিত নহে যা শ্রমে—সে জান্নাত অসুন্দর দৃষ্টিতে তোমার,
তোমার বেহেশ্‌ত জানি হৃদিরক্তে সংগোপন (অশ্রান্ত আশার) !
মৃত্তিকার প্রতিকৃতি ! দেখ এ শ্রমের ফল
সংগ্রামের পথে দুর্নিবার ।।

৫.

'রোজ-ই-আজল'* থেকে প্রতি বীণাতন্ত্রী তব অহর্নিশি ক্রন্দন মুখর
রোজ-ই-আজল থেকে প্রেমের বিপণী মাঝে তুমি একা এনেছো খবর,
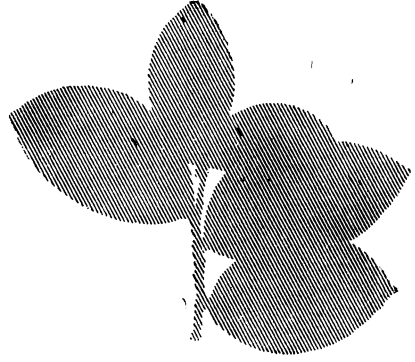
রোজ-ই-আজল থেকে ধ্যানী তুমি খুঁজিয়াছো
চিরদিন রহস্যের ঘর।

শ্রমশীল!

রক্তক্ষয়ী!

শান্তিকামী!

ঊষালোক হ'তে অস্তিত্বের

দেখ চেয়ে,—বলো আজ কোন্ অন্তহীন পথে
নিয়ে যাবে অফুরন্ত ভাগ্য এ বিশ্বের।।

রোজ-ই-আজল*—সৃষ্টির প্রথম দিন

শাহীন

বিদায় নিয়েছি সেই ধূলিম্লান পৃথ্বিতল থেকে
যেখানে জীবন বাঁচে এক কণা শস্যে ধরণীর ।
আনন্দ—আনন্দ মোর মরুভূর নিঃসঙ্গ বিজনে
সৃষ্টির প্রথম থেকে এ প্রাণ অশ্রান্ত রাহাগির ।

বসন্ত বাতাস, ফুল, বুলবুল, পসারিণী আর
আশিকের রুগ্ন সুর ;.......সব কিছু ছেড়ে চলে যাই !
বনের বাসিন্দা যারা—যাদু জানে, যাদুতে ভোলায় !
প্রলুব্ধ প্রাণের সেই সম্মোহনে মুক্তি-স্বপ্ন নাই ।

মরু বিয়াবানে দীপ্ত খরধার তরবারি যার
বিজয়ী, গাজী সে বীর, অস্ত্রে তার অপূর্ব স্পন্দন !
ক্ষুধিত নহিতো আমি কবুতর, তিতিরের তরে
প্রমুক্ত আত্মার মত শাহীনের অবাধ জীবন !

হানা দিয়ে ফিরে যাওয়া, ফিরে এসে হানা দেওয়া আর
আজব বাহানা এই রক্তধারা উত্তপ্ত রাখার
প্রাচী প্রতীচীর মাঝে চকোরীর ক্ষুদ্র এ সংসার ;
আমার আকাশ নীলা—অন্তহীন সাম্রাজ্য আমার ।

পাখীর দুনিয়া মাঝে দরবেশ—ভ্রাম্যমান তাই,
শাহীন বাঁধেনা নীড়—নীড়ে তার প্রয়োজন নাই ।।
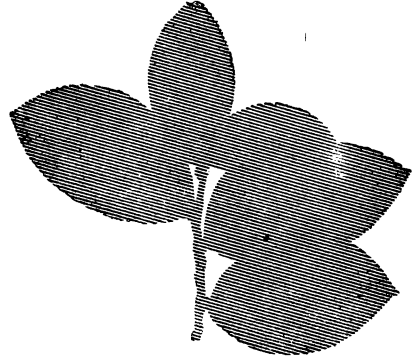
ইনকিলাব

দিন মজুরের রক্তে ধনিক গড়ছে মাণিক 'লা'লে নাব'
সেই জুলুমে কিষাণ চাষীর শ্রমের ফসল হয় খারাব
ইনকিলাব…আয় ইনকিলাব…
তস্‌বি দানায় রাখলো ঘিরে মুফতী ঈমানদারের প্রাণ,
পৈতাধারী বামুন রাখে কাফির জনে লা-জওয়াব
ইনকিলাব…আয় ইনকিলাব…

আমীর ধনিক খেলছে জুয়া, দাবার ঘুটি মিথ্যাময়,
কণ্ঠাগত প্রাণ জুলুমে ; গোলাম তবু দেখছে খ্বাব
ইনকিলাব…আয় ইনকিলাব…
ঘূর্ণী, তুফান, প্রলয় শিখা দেখ চেয়ে তুই মুসলমান,
পুণ্য প্রভাব বিরল এখন, রয় ছড়িয়ে মন্দ ভাব
ইনকিলাব…আয় ইনকিলাব…
দেখ বাতিলের তামাশা আজ, রয় সে সুযোগ সন্ধানে,
বাদুড় পাখীর হামলা দেখে মুক্ত ভোরের এ আফতাব
ইনকিলাব…আয় ইনকিলাব…
গীর্জাতে হায় ফাঁসি কাঠে ঝুলছে ঈসা নবীর তনু,
কা'বা থেকে বিদায় নিল মুস্তফা ; উন্মুল কিতাব
ইনকিলাব…আয় ইনকিলাব…
দিন মজুরের রক্তে ধনিক গ'ড়ছে মানিক 'লা'লে নাব'
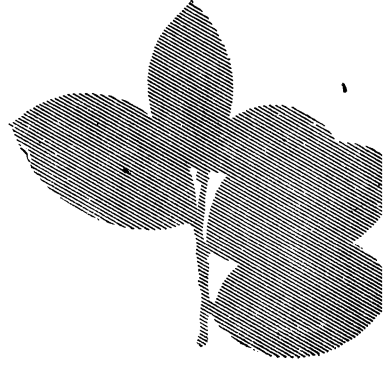
খোদার ফরমান

ওঠ,—দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও।
ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও ॥

কর ঈমানের আগুনে তপ্ত গোলামী খুন,
বাজের সমুখে চটকের ভয় ভাঙিয়ে দাও।
ঐ দেখ আসে দুর্গত দীন দুখীর রাজ ;
পাপের চিহ্ন মুছে যাও, ধরা রাঙিয়ে দাও ॥

কিষাণ মজুর পায়না যে মাঠে শ্রমের ফল,
সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও।
স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কেন আড়াল ?
মধ্যবর্তী মোল্লাকে আজ হাঁকিয়ে দাও ॥

(অংশ)
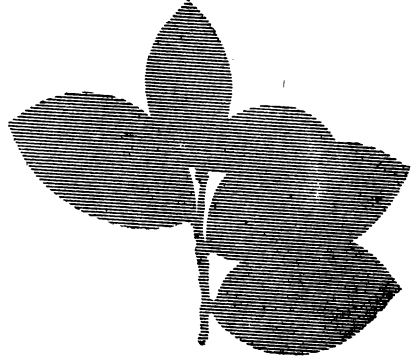
গজল ও গীতিকা

১.

রঙিন লা'লার দীপ শিখাতে হ'ল উজল শিলা কানন।
গানের দোলা জাগিয়ে গেল বন বিহগের কল কূজন ॥
এই বিজনে উঠ্‌লো ফুটে ফুল না ওরা পরীর দল।
নীল ঘন নীল বর্ণ বিভা, স্বর্ণ তনু, পর্ণাভরণ ॥
ভোরের হাওয়া ছড়িয়ে গেল মোতির মালা এই শিশির,
পাপড়ি পাতায়, মুক্তা মালায় উজ্জ্বল দিন—সূর্য কিরণ ॥
রূপের নেকাব উঠিয়ে নিতে ঐ অপরূপ মুখের 'পর
কি চাহে আজ ? মুখর দিনের নগর না এই বনভবন ॥
যাও ডুবে আজ আপন মাঝে তুলতে গোপন রত্ন বিভব,
আমার যদি না হও তুমি, হওনা কেন নিজের আপন ॥
মনের ভুবন জানি আমি দীপ্ত শিখা প্রতীক্ষার,
তনুর ভুবন জানি সেতো—বঞ্চনা শেষ, শ্রান্তি মগন ॥
মনের বিভব আসলে মনে হারায় না সে আর কখনো,
তনুর বিভব ক্ষণিক ছায়া নিমেষে তার অপসরণ ॥
মনের ধরায় পাইনি আমি অচেনা দূর দেশীর রাজ,
পাইনি আমি মনের ধরায় কোন্ জনা শেখ—কে ব্রাহ্মণ ॥
কলন্দরের তত্ত্ব কথায় জীবন ভরি' ঘনালো সাঁঝ
নয়গো আপন এই তনুমন অন্যে করি সমর্পণ ॥
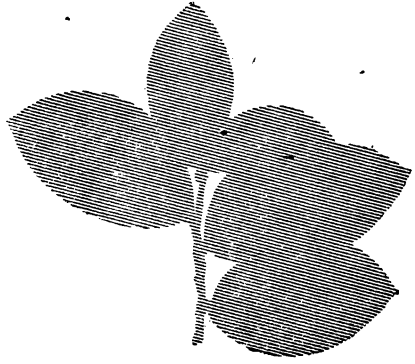
২.

নহ তুমি ধূলির তরে,

নহ নভঃনীলার তরে,

বিশ্ব নিখিল তোমার তরে,

তুমি নহ ধরার তরে ।।

দুঃখ-বিষাদ কাঁটায় ঘেরা

এই ধরণী—পৃথ্বিতল,

নয় গো এ ঠাঁই আশিয়ানার ;

নয় সুখ নীর বাঁধার তরে ।।

আর কত কাল রইবে তুমি

এই 'রাবী', 'নীল', 'ফোরাত' মাঝে

তরী তোমার অকূল সাগর

উর্মি-উতল বাধার তরে ।।

চাঁদ সিতারার কক্ষে যারা

নির্দেশ দিত আপন হাতে,

আকুল চোখে চায় তারা হায়

আজকে নতুন দাতার তরে ।।

এমন বাণী আছে আমার

জানে না যা জিব্রাইল,

রেখেছি সেই বাণী গোপন

আরো সুদূর ধরার তরে ।। (অংশ)
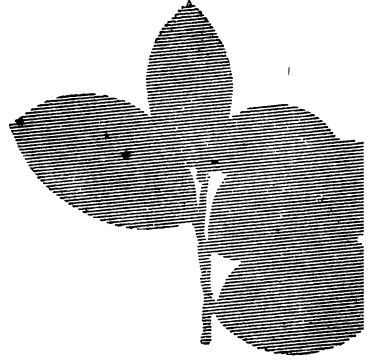
৩.

এই সিতারার শেষে জাহান আছে আরো ।
প্রেমের পথে ঝঞ্ঝা তুফান আছে আরো ॥
শূন্যতা মোর শূন্য নহে প্রাণ পরশে,
এই কাফেলায় দল অফুরান আছে আরো ॥
গন্ধ-রঙে রঙিন ধরায় আজ থেমো না,
নীড়ের স্বপন, ছায়া বিতান আছে আরো ॥
ঊর্ধচারী শাহীন তুমি নভঃগামী !
আকাশ পারে আকাশ খিলান আছে আরো ॥
শেষ হ'ল আজ একলা থাকার ক্লান্ত দিন ;
এই পথে মোর সন্ধানী প্রাণ আছে আরো ॥ (অংশ)
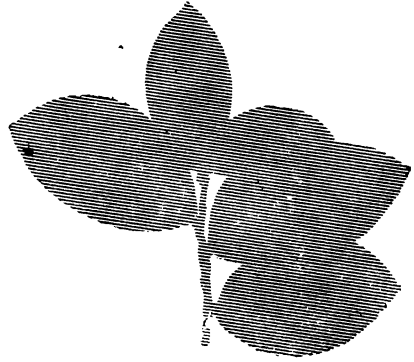
তারেকের দো'আ

(স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে সিপাহ্সালার তারেকের প্রার্থনা)

এরা গাজী—এরা রহস্যজ্ঞানী বান্দা যে মহাবীর
যাদের উপর দিলে তুমি খোদা শুভাশীষ খোদায়ীর।
সাগর, সাহারা যাদের আঘাতে ভেঙে পড়ে দুই ভাগে,
শিলা শিহরায়, পাহাড় চূড়ায় ভয়ের নিশানা জাগে,
দুই আলমের বাজুবন্দ ছেড়ে বে-গানা করে যে দিল,
একী তার স্বাদ খুলে যায় যবে ঈশ্‌কের ঝিলমিল !

ঈমানদারের চরম বাসনা, লক্ষ্য যে শাহাদত,
দুনিয়া বিজয় শেষ চাওয়া নয়, চায়না সে গণিমত।
কত সুদীর্ঘ দিবস রজনী প্রতীক্ষমানা লা'লা
রক্তাভরণ চেয়েছে আরবী শহীদের লহু ঢালা !

এ মরুবাসীরে ক'রেছ একক বিরাট শক্তিবলে,
ভোরের আজানে, প্রভাতের টানে, চেতনা বহ্নিতলে,
ছিল অচেতন যে জীবন এই শতকের ঘুমঘোরে
নতুন চেতনা ফিরে এল তার অজানা এ বাহু ডোরে।
হৃদয়ের দ্বার খুলিবার মত অপরূপ মনে হয়;
মরণ আজিকে তাই কারু চোখে চরম মৃত্যু নয়।
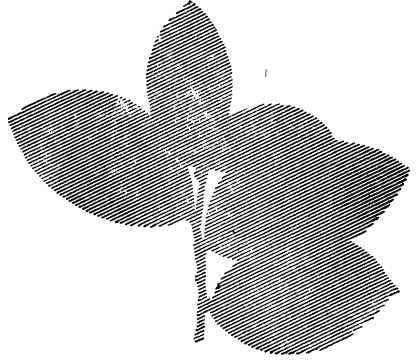
মুসলমানের দিল তুমি আজ আবার জিন্দা করো,
"ভয় নাই"—এই অভয় বাণীর বিজ্‌লি মশাল ধরো,
প্রতি হৃদয়ের সংকল্পের রূপ দাও দৃঢ়তার ;
সব মুমিনের দৃষ্টিকে তুমি কর আজ তল্‌ওয়ার ॥

কর্ডোভা মস্‌জিদ

১.

দিন রাত্রির এ ধারা অধীর,—প্রতি কাহিনীর শিল্পী এই,
দিন রাত্রির এ ধারা অধীর,—জীবন মৃত্যু এরি মাঝেই !
দিন রাত্রির এ ধারা অধীর,—দু'রঙে রাঙানো এই 'হারীর'
—এ রেশমে বোনে মূল সত্তা যে অশেষ বসন গুণাবলীর।
দিন রাত্রির এ ধারা অধীর, বীণা তারে সুর শাশ্বতের,
এরি মাঝে দেখে আদি সত্তা যে সব উত্থান ; পতন ফের।
দিন রাত্রির এ ধারা অধীর কুশলী যাচাইকারীর মত
তোমারে আমারে নিখিল ধরারে করে পরীক্ষা প্রতিনিয়ত।
যদি তুমি হও মূল্যবিহীন, যদি আমি হই অকিঞ্চন
মৃত্যু তোমার ললাট লিখন, আমারো ললাট লিপি মরণ।
কোন্ হাকিকত রাত্রি দিনের (সন্ধ্যা অথবা রাঙা প্রভাত) ?
সময়ের এক তরঙ্গ শুধু, নাই সেথা দিন, নাইতো রাত।
শুধু ক্ষণিকের বসতি এখানে, মৃত্যু এ পথে রয়েছে দায়ী,
ক্ষণস্থায়ী যে পৃথিবীর কাজ, দুনিয়ার কাজ ক্ষণস্থায়ী।
জানি আউয়াল, আখির ফানা ও জাহির বাতিন সকলি ফানা ;
যত তস্‌বির এই ধরণীর নবীন প্রাচীন সকলি ফানা ।।
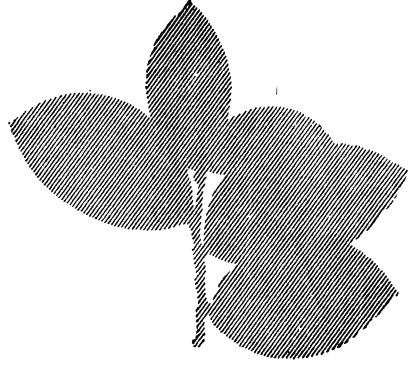
২.

সেই তস্‌বির যার বুকে ছাপ রেখেছে সময় চিরন্তন,
শেষ রেখা যার এঁকেছে মুমিন—মর্দে খোদা যে, খোদার জন,
প্রেমের পরশে মহীয়ান তার কর্মের ধারা অবিশ্রাম ;
প্রেমের উৎস সত্য জীবন মরণ যে তার হ'ল হারাম !
দ্রুত ধাবমান আর চঞ্চল যদিও কালের অমিত বেগ
বন্যা বিপুল এই প্রেম ধারা, পারে সে থামাতে বন্যাবেগ।
বর্তমানের দিন ক্ষণ ছাড়া প্রেম-পঞ্জিতে জেনেছি তাই
রয়েছে অশেষ অজানা সময়, যাদের সঠিক অংশ নাই।
জিব্রাইলের নিঃশ্বাস প্রেম, প্রেম যে হৃদয় মুস্তফার,
জানি আল্লার রাসুল এ প্রেম, প্রেমেই খোদার কালাম সার।
প্রেম মত্ততা ক'রেছে ধূলিকে উজ্জ্বলতর, বহ্নিমান,
সুরা ও শারাব—পেয়ালা এ প্রেম মুখ দেখে যাতে মুগ্ধ প্রাণ।
কা'বার পথিক এই প্রেম, আর এই প্রেম হয় সিপা'সালার,
প্রেম রাহাগির, মঞ্জিল পথে রয়েছে হাজার মকাম তার।
জীবন-তন্ত্রী প্রেমের পরশে পেল গীতিকার এ সঞ্চয়,
প্রেম থেকে এল জীবনের জ্যোতি ; প্রেম থেকে প্রাণ বহ্নিময়।

৩.

প্রেম থেকে জানি অস্তি তোমার ওগো মস্‌জিদ কর্ডোভার,
ক্ষয় নাই যার, নাই তো বিলয়, অতীত অথবা অধুনা আর।
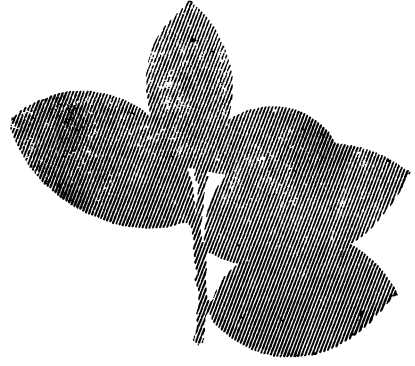
হোক্ তস্‌বির অথবা পাথর, বেণুকার সুর অথবা গান
হৃদয়-রক্ত কণায় শিল্প হয় জীবন্ত হৃদি সমান।
শিলাকে যে করে জিন্দা দিল, সে জিগরের তাজা কাতরা খুন,
হৃদয়-রক্তে জাগে অসহন বেদনা দহন, সুর ; আগুন।
হৃদয়-জাগানো প্রেরণা তোমার, হৃদয়-জ্বালানো আমার গান ;
তুমি শুধু ডাকো আমি খুলে যাই সকল হৃদয় তিমির-ম্লান।
যদিও সীমিত এক মুঠো ধূলি দেখ চেয়ে রূপ নভঃনীলার
আরশের চেয়ে কম নয় জানি আদমের সিনা—বক্ষ তার।
কতটুকু লাভ, ফায়দা কি বল সিজদায় এই ফেরেশ্‌তার,
পাবে সে কোথায় আতশী দহন, আবেগ এমন ;—বেদনা ভার।
যদিও কাফের আমি হিন্দের দেখ এ জওক, শওক ঘোর,
দরূদ সালাত হৃদয়ে আমার, দরূদ সালাত ওষ্ঠে মোর।
তীব্র বাসনা সুর তন্ত্রীতে, তীব্র বাসনা বেণু-বীণায়,
জাগে ঃ আল্লাহু, আল্লাহু গীতি প্রতি ধমনীতে, প্রতি শিরায়।

৪.

অপরূপ এই গঠন তোমার, মর্দে খোদার এই দলিল ;
সে-ও ছিল জানি জলিল, জমিল ;—তুমিও জলিল, তুমি জমিল।
ভিত্তি তোমার রয়েছে অটুট, বেশুমার থাম হয়নি নত,
র'য়েছে দাঁড়ায়ে সিরিয়ার বালু বক্ষে খেজুর বীথির মত।
তুর পাহাড়ের নূর দেখা যায় তোমার মুক্ত দরজা থেকে,
জিব্রাইলের ইশারা যেমন মিনার চূড়ায় যায় গো ডেকে।
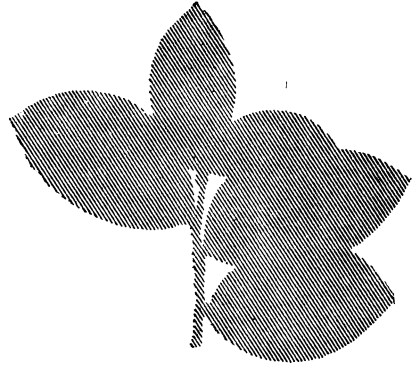
মর্দে মোমিন—মুসলমানের সত্তা কখনো মেটেনা জানি,
আজান ধ্বনিতে খুলেছে সে মুসা, ইব্রাহিমের গোপন বাণী।
জমিনের নাই গণ্ডী যে তার, আসমান তার সীমানাহীন,
দজ্‌লা, ফোরাত, দানিয়ুব, নীল তার দরিয়ার স্রোতে বিলীন।
দেখেছে সে জানি জটিল সময়, জানে সে কাহিনী সুরের রেশ,
গত রাত্রিকে অনাগত পথে চ'ল্‌বার সেই দিল নিদেশ।
তৃষিত প্রাণের সাকী সেই জানি,—মরু পথ-চারী আকাঙ্ক্ষার,
খাঁটি শারাবের পেয়ালা সে হাতে, হাতিয়ারে খাদ মেশেনি আর।
বীর সৈনিক হাতে তলোয়ার ঃ লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্......
তলোয়ার ছায়ে বর্ম যে তার ঃ লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্......

৫.

রহস্য যত মোমিন জনের তোমার তরেই হ'ল প্রকাশ,
আতশী দিনের আবেগ যে তার, দীর্ঘ রাতের তপ্ত শ্বাস।
বুলন্দ্‌ মকাম পেয়েছে সে যার কল্পনা ছোঁয় নভঃকিনার,
তার মত্ততা, অপার বাসনা, নম্রতা আর গরিমা ভার।
বান্দা মোমিন মুসলমানের হাত জানি আমি খোদার হাত,
কারিগর সেই কর্মস্রষ্টা, জয় গাথা লেখে যার বরাত।
খাকে আর নূরে গড়া যার তনু পেল সে বান্দা প্রভুর গুণ,
দু'জাহান থেকে মুক্ত সে জানি, দিল বে-নেয়াজ প্রেম-আগুন।
স্বল্প উমিদ, মহৎ লক্ষ্য ছুঁয়ে যায় তার আকাশ নীল,
তার আচরণে, তার দৃষ্টিতে জিন্দা হয় যে মুর্দা দিল।
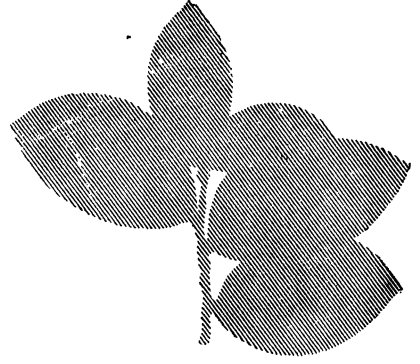
মধুর অথবা সেই মৃদুভাষী, ক্ষিপ্ত শুধু সে অন্বেষণে,
জঙ্গে জেহাদে মুক্ত হৃদয়, সততা সুঠাম জাগে সে মনে।
মর্দে খোদার দৃঢ় বিশ্বাস চির সত্যের কেন্দ্রভূমি,
তামাম আলম শেষ হয় যেথা শুধু কুহেলির প্রান্ত চুমি'।
যুক্তি জ্ঞানের সেই মঞ্জিল,—প্রেম থেকে গড়া সত্তা যার,
সারা বিশ্বের মহফিলে সেই দীপ্ত আত্মা পূর্ণতার।

৬.

ওগো মস্‌জিদ! প্রাণৈশ্বর্যে ধর্মের তুমি মুক্ত দান,
তোমার তরেই আন্দালুসিয়া পেয়েছে জমিনে কা'বার মান।
তোমার তুলনা খোঁজে যদি কেউ আকাশের নীচে এই ধরায়,
পাবে সে কেবল মোমিনের দিলে পাবেনা অন্য কাল ছায়ায়।
আহা সেই সব সত্য পথিক আরবের বীর ঘোড় সোয়ার
ঈমানের পথে মুজাহিদ যারা আন্‌লো মহৎ নীতি বিচার,
রহস্য গাথা তাদের জীবন, তাদের শাসন খুলেছে এই
হৃদয়ের এই রাজ্য শাসনে রাজসিকতার ম্লানিমা নেই।
প্রাচী প্রতীচীকে শেখালো তারাই, খুলে দিল দ্বার বিজ্ঞানের,
শত অজানার আঁধার যখন ছিল বুকে চেপে প্রতীচ্যের।
আজো দেখি তাই তাদের রক্তে আন্দালুসের নারী ও নর
উজ্জ্বল মুখ, উদার হৃদয়, আতিথেয়তায় নয়তো পর।
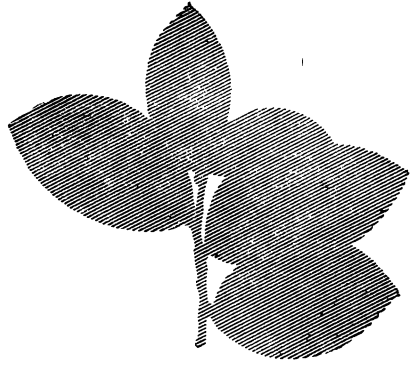
আজো দেখি তাই সঞ্চরি ফেরে মৃগাক্ষী যত কাননময়,
এখনো তাদের দৃষ্টির তীর পার হয়ে যায় ভীরু হৃদয় ;
'য়েমনের সেই খোশবু হাওয়ায় পাই যে এখনো, ওঠে যে রণি'
এ মাটির গানে আরবের সুর,—দূর হেজাজের প্রতিধ্বনি।

৭.

সিতারার চোখে তোমার জমিন অপরূপ নীল নভঃ সমান,
কত শতাব্দী, আহা কত যুগ শোনেনি এ মাটি সেই আজান।
কোন্ সে বিরান অধিত্যকায় অথবা সে কোন্ জমিনে হায়
ঝঞ্ঝা ঝড়ে ও ঘূর্ণাবর্তে প্রেমের কাফেলা পথ হারায়!
দেখেছে একদা জার্মানী তার ধর্মীয় নীতি সংস্কার,
পুরাতন রীতি স্মৃতির নিশানা জানি কোনখানে রাখেনি আর,
পাদ্রী পোপের সততা এখন যেন সে অলীক আখ্যায়িকা,
ছুটেছে এখন চিন্তার তরী সম্মুখে স্রোত কুজ্ঝটিকা।
আঁখি বিস্ফারি দেখেছে ফরাসী খুন-রাঙা সেই ইনকিলাব,
প্রতীচীর বুকে দিয়েছে যা এনে বিপর্যয়ের এ সয়লাব।
জীর্ণ প্রাচীন রোম ছিল নিয়ে রক্ষণশীল প্রথা, বিচার,
নব জাগরণে চেয়েছে সে ফিরে নওজোয়ানীর নও বাহার।
সেই বিক্ষোভ ঘূর্ণীতে ঘোরে ইস্লাম আর মুসলমান,
এ খোদায়ী 'রাজ'—রহস্য যার পারে না জানাতে কারু জবান।
দেখ সমুদ্রতল হতে কোন্ সম্ভাবনার হয় প্রকাশ,
দেখ কোন রঙে বদ্লায় আজ নীলা গম্বুজ—নীল আকাশ।
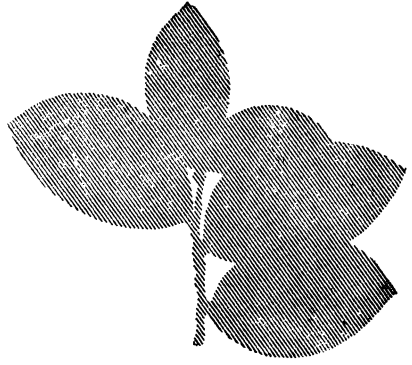
৮.

গোধূলি-মগ্ন মেঘ ছুঁয়ে যায় খাড়া পাহাড়ের উঁচু কপাল,
সূর্যাস্তের রক্তাভা যেন বাদাখশানের হিরক লাল !
সহজ, সরল কৃষাণ কুমারী গেয়ে যায় এক আতশী গান,
হৃদয় তরীর পথে যৌবন যেন উচ্ছল বিপুল বাণ।
শোন নদী ধীর 'বাদিল কবীর' বিদেশী পথিক তীরে তোমার,
দুই চোখে তার নেমেছে এখন অন্য যুগের স্বপ্নভার।
আছে তক্দির পর্দা আড়ালে লুকানো এখনো নয়া জাহান,
নেকাব-মুক্ত তবু তার উষা দু'চোখে আমার দীপ্তিমান।
যদি চিন্তার মুখ থেকে আমি সরাই ঘোমটা ; প্রতীচী তবে
হবে চঞ্চল, আমার গানের অগ্নি দহনে অধীর হবে।
মরণ সমান সে জীবন, যেথা নাই বিপ্লব—ইনকিলাব !
সকল জাতির এই প্রাণধারা, চিত্ত বিভব—ইনকিলাব !
ভাগ্যের হাতে কওম যেমন খর তরবার তীক্ষ্ণধার,
প্রতি মুহূর্তে নেয় যে হিসাব, নাই নিষ্কৃতি সেখানে আর।
সকল চিত্র অসম্পূর্ণ হৃদয়ের তাজা রক্ত ছাড়া ;
সব সংগীত বিষাদে পূর্ণ হৃদয়ের তাজা রক্ত ছাড়া ।।
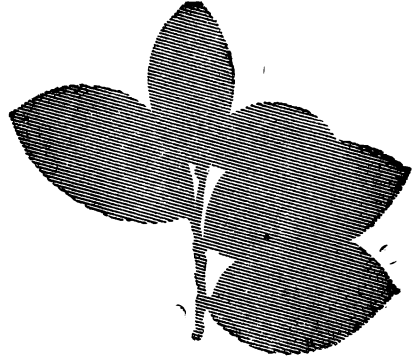
জিব্রাইল ও শয়তান

জিব্রাইল

প্রাচীন দিনের সঙ্গী! গন্ধ ও বর্ণের বিশ্বে কি নিয়ে তোমার দিন যায়?

শয়তান

অগ্নি ও আক্রোশে তিক্ত, বিস্বাদ ব্যথায় ম্লান, প্রতীক্ষায়, ক্লান্ত প্রত্যাশায়।

জিব্রাইল

যায় না এমন ক্ষণ যখন তোমার নাম জান্নাতে হয় না উচ্চারণ!
হৃত গৌরবের পথে পারো না কি মুছে দিতে গ্লানি-ম্লান ও ছিন্ন দামন?

শয়তান

কী গোপন অভিশাপে জ্বলি আমি রাত্রিদিন বুঝিবেনা—হায় জিব্রাইল!
বিভ্রান্ত, উন্মাদ চিত্ত জান্নাতে এসেছি ফেলে পান-পাত্র—স্বপ্নের নিখিল!
এখানে ধরার বক্ষে মুহূর্তের অধিবাস—অসম্ভব; এ যে অসম্ভব।
এ নৈঃশব্দে নাই পথ, গৌরব-প্রাসাদ নাই; নাই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের রব!
আশার বিদ্যুৎ যার নিখিল বিশ্বের বুকে ছায়া ফেলে তিক্ত বেদনার
কি আশ্বাস দেবে তারে, নিরাশ হোয়ো না কভু কৃপাময়—

কৃপায় আল্লার?
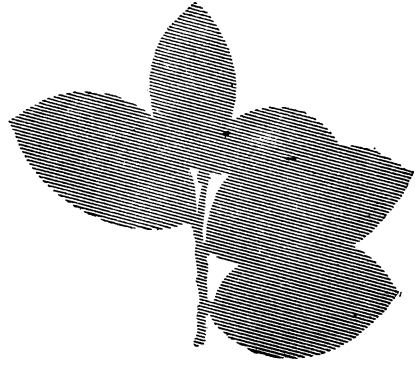
জিব্রাইল

তোমার উন্নত শির নামায়েছে ধূলিতলে অকল্পিত বিদ্রোহ তোমার,
অবশিষ্ট আছে আর ফেরেশতার কি সম্মান, কি মর্যাদা দৃষ্টিতে
আল্লার ?

শয়তান

আমার বিদ্রোহী আত্মা জ্বালিয়াছে অনির্বাণ বহ্নিশিখা আদমের বুকে
আমারি বিদ্রোহে যুক্ত বুদ্ধি-মননের বস্ত্রে ধূলিমুষ্টি চলেছে সম্মুখে।
সত্য অসত্যের দ্বন্দ্বে দ্রষ্টা তুমি দূরবর্তী দূরপ্রান্তে আছো দিবাযামী,
প্রমত্ত ঝঞ্ঝার মুখে কে জাগে সংগ্রামী চিত্ত—জিব্রাইল। তুমি কিম্বা আমি?
খিজির সহায়হারা, অসহায় ইলিয়াস সে ঝড়ের প্রমত্ত গতিতে।
আমার ঝঞ্ঝার পথ সমুদ্রে সমুদ্রে আর তরঙ্গিত নদীতে নদীতে।
তবু তুমি এই প্রশ্ন শুধায়ো আল্লার কাছে পাবে তাঁর যখন দিদার,
মানুষের ইতিহাস উজ্জল হয়েছে আজ অফুরান প্রাণ-রক্তে কার ?
সর্বশক্তিমান যিনি—বিকীর্ণ কাঁটার মত বক্ষে তাঁর জাগি যে অম্লান,
চিরন্তন কাল শুধু তোমরা গুঞ্জরি যাও ঃ সুমহান প্রভু সুমহান।
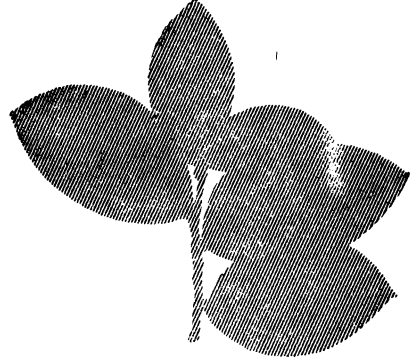
বু'আলী কলন্দর

মুহব্বতের কুঞ্জতে যখন সত্তার পূর্ণতা
শক্তি তাহার মুষ্টিতে আনে
সসাগরা ধরাতল,
তার কব্জায় ঝলসিয়া ওঠে আল্লার দেওয়া বল !
ধরা পড়ে তার মুঠিতে ধরার
সঞ্চয়; সম্বল ।
ভাঙে সে রাতের নিদ,
নির্দেশ তার মেনে চলে ভয়ে দারিয়ুস ; জামশীদ ।

যাঁর কথা জানে সারা হিন্দুস্তান—
জালালী ফকীর বু'আলী কলন্দর,
যার পরশনে মরুভূমি হ'ল
জান্নাত-সুন্দর,
প্রসঙ্গ যাঁর এনে দিল ফের
তাজা গোলাবের গান,
তাঁর জীবনের একটি কাহিনী
শোনাবো অতঃপর ;
—তামাম হিন্দে মশহুর যিনি
বু'আলী কলন্দর ।
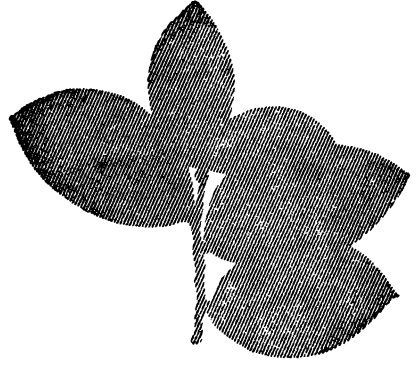
এক দিন তাঁর ভক্ত মুরীদ চলেছিল পথে একা,
ফুটেছিল তাঁর ললাটে চিন্তা, ধ্যান-গম্ভীর লেখা।
বাদশার প্রিয়, সুবার আমীর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে
চলেছিল, সাথে লশ্‌কর চলে তাঁর নির্দেশ বয়ে।
সমুখে যখন পড়িল তাঁদের ফকীর দীউয়ানা সেই
নকীব তখন ফুকারিয়া বলে এই ঃ
"বেহুঁশ পথিক পথ ছেড়ে চল আমীর ওমরাহের।"

দুনিয়ার হাল ছিল না সে ফকীরের,
আপনার ভাবে বিভোর হ'য়ে সে চ'লেছিল এক মনে,
আমীরের এক উদ্ধত দাস নির্ভীক সেই ক্ষণে
ক্রুদ্ধ আঘাত হানিল হেলায় শিরে সেই ফকীরের।
আমীরের পথ ছাড়িয়া আহত ফকীর চলেন ফের।
ক্ষত মস্তক জীর্ণ বস্ত্রে বাঁধি'
কলন্দরের দরবারে এসে ফকীর পড়িল কাঁদি'।

গর্জি উঠিল নিমেষের মাঝে বু'আলী কলন্দর,
জ্বলিয়া উঠিল আগুনের মত প্রশান্ত অন্তর,
গলিত লাভার বন্যা ভাসালো সুষুপ্ত বন্দর।

মিসমার করি বজ্র যেমন পড়ে পর্বত চূড়ে
তেমনি আদেশ ধ্বনিয়া উঠিল কলন্দরের সুরে,
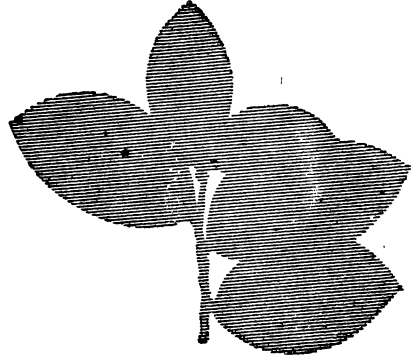
বলিল : এখনি ফকীরের লিপি দাও শাহী দরবারে,
দরবেশী এই পত্র পাঠাও হিন্দের বাদশারে,
"আমার ভক্ত মুরীদে মেরেছে আমীর অকস্মাৎ,
ঢেলেছে সে তার জীবনে তীব্র জ্বলন্ত হুতাশন,
এখনি বন্দী কর তুমি সেই—আমীর খবীস-মন ;
নতুবা অন্য জনারে দানিব তোমার সালতানাত।"

আল্লাহ্-ওয়ালা ফকীরের চিঠি গেলে বাদশার কাছে
থর থর করি' কাঁপিয়া উঠিল বাদশা বিষম ভয়ে,
সূর্য যেমন নিষ্প্রভ হয় রোশনি আসিলে ক্ষয়ে
বিবর্ণ হ'ল বাদশা তেমনি ফকীরের চিঠি পেয়ে।
হাতকড়া এক পাঠালো তখনি সেই আমীরের তরে
কলন্দরের কাছে মাফ চায় বাদশা বিষম ডরে।

বু'আলীর কাছে দূত হ'য়ে গেল আমীর খসরু কবি,
—যাঁর কাব্যের মাধুরি জাগাতো জোছনা রাতের ছবি,
যাঁর সুর জাল জাগিত গভীর মৌলিক মন হতে,
ভেসে যেত এই হিন্দের বুক সে সুর-ধারার স্রোতে...
তাঁর সঙ্গীতে বু'আলীর মন গলিল কাঁচের মত,
কাব্য সুষমা রাখিল সেবার বাদশাহী অক্ষত।
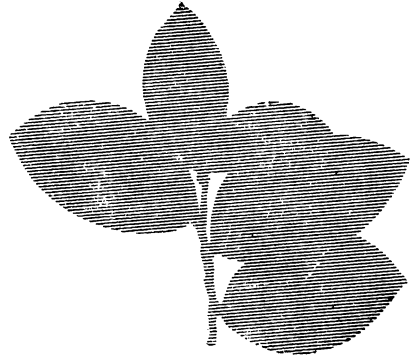
পাহাড়ের মত সাম্রাজ্য সে তবু
হ'ল মহীয়ান কাব্যের সরণিতে !
আহত কোরোনা ফকীরের দিল কভু,
ফেলো না নিজেকে জ্বলন্ত বহ্নিতে ॥
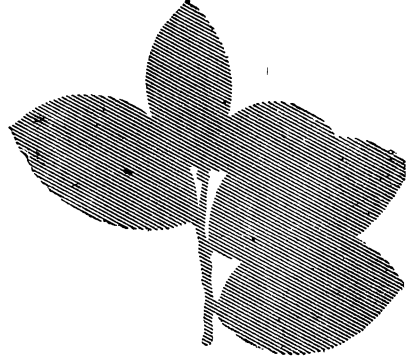
পাঞ্জাবের পীরজাদাদের উদ্দেশে

মুজাদ্দিদের মাজারে আজ এ দিল বেকারার !
আকাশ তলে মাটি যেমন আলোর সম্ভার ॥
পায় সিতারা শরম যে এই ধূলি কণা দেখে,
হেথায় গোপন মর্দে মুমিন সাহেবে আস্‌রার ॥
জাহাঙ্গীরের সম্মুখে যাঁর হয়নি নত শির,
নিঃশ্বাসে যাঁর উষ্ণতা পায় আজাদী-আহ্‌রার ॥
হিন্দে যিনি মিল্লাতেরি ছিলেন নেগাহ্‌বান্‌,
আল্লা যাঁকে ক্রান্তিকালে করেন হুঁশিয়ার ॥
আর্‌জি ওঠে তখন প্রাণের : দাও ফকীরি মোরে,
দুই চোখে হায় দৃষ্টি তবু জাগ্রত নই আর ॥

আফসোস এই জিন্দেগীতে হওনি শাহীন তুমি,
দৃষ্টি তোমার এই জীবনে চেনেনি ফিত্‌রাত,
সকল ভাগ্য নিয়ন্তার এ অমোঘ বিধান জেনো
দুর্বলতার কঠিন সাজা মৃত্যু অপঘাত ॥
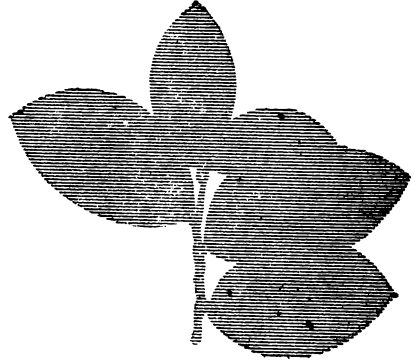
পাশ্চাত্যের শক্তি

পাশ্চাত্যের শক্তি সে নয় রোবাব অথবা বেহালাতে,
নাই সে শক্তি পর্দাবিহীন নারীর নৃত্য জলসাতে,
নাই সে শক্তি পুষ্পমুখী ও যাদুকরীদের মায়াজালে,
নাই অভিনব কেশ-কর্তনে, নগ্ন উরুর তালে তালে,
নাই সে শক্তি নাস্তিকতায়—ধর্মবিহীন মতামতে
নাই সে শক্তি লাতিন হরফে—প্রাচীন লিপির শরাফতে,
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প থেকে সে পেয়েছে বিশ্বে বিপুল বল,
এ আগুন থেকে চিরাগ যে তার হ'ল রওশন—সমুজ্জ্বল ।

নাই হিকমত পোশাকের ছাটে, পাবে না জামার বদৌলতে ;
প্রতিবন্ধক নয় জেনো কভু পাগড়ি আমামা জ্ঞানের পথে ।।
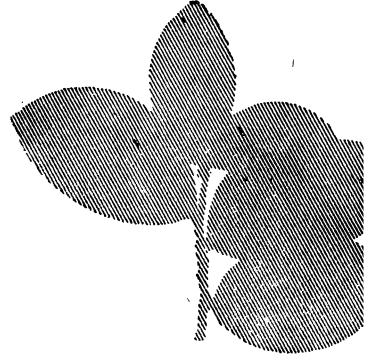
গতি

সারা জাহানের জিন্দেগী শুধু চলার মাঝে,
"রস্‌মে কদিম"—এ রীতি প্রাচীন সকল কাজে।

শোন রাহাগির ! এ পথে দাঁড়ানো কুহক প্রীতি,
গতিহীনতার মাঝে সুগোপন মরণ ভীতি।

যারা গতিমান, এই পথে তা'রা গিয়াছে হেসে,
দাঁড়ায়েছে যারা শেষ হ'ল তা'রা জড়ের বেশে।
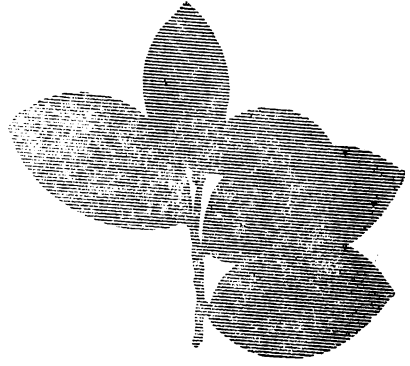
আমলে বরজাখ

মুর্দা

সে আগামী কাল কবে, কোন দিন ;—রোজ কেয়ামত হবে যখন
যদি জানো তুমি প্রাচীন আবাস ! বল তবে তার রূপ কেমন।

কবর

জানো না কি তুমি শত বর্ষের মুর্দা তুহিন মরণে ছাওয়া
রোজ কেয়ামত প্রতি মৃত্যুর পিপাসা-বিধুর চরম চাওয়া।

মুর্দা

পরম কাম্য রোজ কেয়ামত গোপন চাওয়া যে মরণে, তার
পড়ি নাই ফাঁদে, হইনি শিকার,—নাই সংযোগ সাথে আমার।
মৃত লাশ আমি শত বর্ষের, একশো বছর হ'য়েছে পার ;
তবু নই আমি পেরেশান এই আঁধার জঠরে মৃত্তিকার।
আর একবার জীর্ণ এ দেহে আত্মা আমার হবে সোয়ার,
—এই যদি হয় রোজ কেয়ামত, তবে নই আমি খরিদ্দার।

গায়েবী আওয়াজ

সাপ, বৃশ্চিক আর পশুদল,—কারো তক্‌দির নয় এমন,
দাস জানি যারা তাদের ভাগ্যে রয়েছে মৃত্যু চিরন্তন।
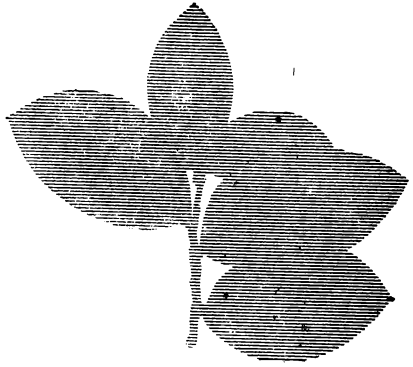
ইস্রাফিলের আওয়াজ ওদের পারেনা তো দিতে ফিরায়ে প্রাণ,
জীবনেও ওরা মরার শামিল, বোঝা ব'য়ে যায় অপরিমাণ।
মৃত্যুর পরে ফিরে যাওয়া প্রাণে মুক্ত জনের এ তকদির,
জীবিত প্রাণীর ভাগ্যে যদিও আছে একবার স্বাদ মাটির।

কবর (মুর্দার প্রতি)

দুনিয়ায় ছিলে গোলাম, কেন তা বলনি জালিম দীর্ঘ দিন ?
বুঝেছি এবার কি কারণে, কেন আমার এ খাক কাল কঠিন !
মলিন আমার এ মাটির রঙ হ'ল কাল সিয়া তোমারি তরে,
ইজ্জৎ হারা এ মাটির মন ওঠে শিহরিয়া তোমারি তরে।

মাটির দো'আ

শোন পাক জাত মালিক আল্লাহ্ !—শোন ফরিয়াদ আজ আমার,
পানাহ্ দাও খোদা ! গোলামের লাশ থেকে পানাহ্ চাই হাজার বার।

গায়েবী আওয়াজ

এই পদ্ধতি প্রাণের যদিও আনে সৃষ্টিতে বিপর্যয়,
তবু রহস্য জিন্দেগানির এ পথেই হয় জীবনময়।
'জলজলা' ঐ ভূকম্পনের যে আঘাতে ওড়ে খাড়া পাহাড়,
সে জলজলায় অধিত্যকায় ফিরে আসে ফের নও বাহার !
অপরিহার্য সৃষ্টির পথে চরম ধ্বংস বিশ্বত্রাস
জীবন বোধের জটিল চক্রে এই সমাধান,—এ আশ্বাস।
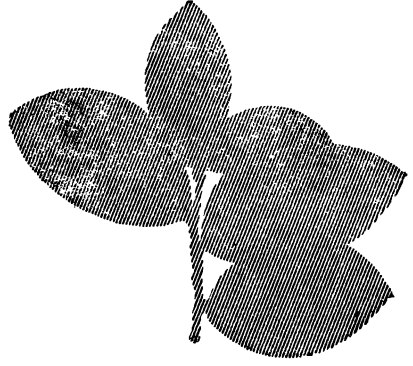
জমিন

এ চিরন্তন মৃত্যু এবং জিন্দেগানির এই জেহাদ,
এই সংগ্রাম হবে নাকি শেষ, মিটবে নাকি এ বিসম্বাদ ?
পুতুল-পূজার মোহ থেকে মন পায়নি তো আজও তার নাজাত,
জ্ঞানী, জ্ঞানহীন হয়েছে গোলাম, প্রভু যে ওদের লাত মানাত।
কোথায় অতলে হারালো মানুষ, হারালো কোথায় সেই সিফাত।
দৃষ্টিতে আর হৃদয়ে আমার এ যে গুরুভার শিলা প্রপাত।
কেন মানুষের দুঃখ রাতের শেষে নামছে না আজ প্রভাত ?

*'আলমে বরজাখ'—আত্মাসমূহের স্বতন্ত্র বিশ্ব।
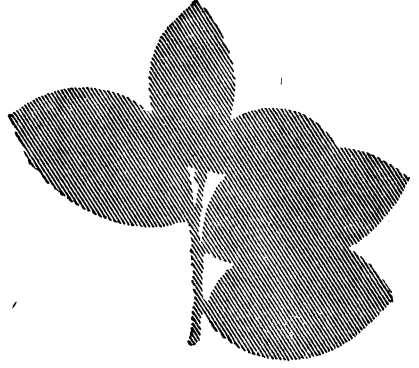
জামানা

যা আছে আজ আর হবে না,
যা ছিল তার নাই নিশানা,
আসেনি যা তারি পথে
জাগে অশেষ এই জামানা ।।

কণায় কণায় যায় ছড়িয়ে
এই সুরাহি পাত্র থেকে,
গণি আমি আপন মনে
দিন রজনীর তস্‌বি দানা ।।

সবার সাথে চেনা আমার
তবু যে মোর পথ নূতন
বাহন আমি, আমি সওয়ার ;
কঠিন আমার আঘাত হানা ।।

কার বল দোষ, — যদি তুমি
না এলে মোর মহ্‌ফিলে,
রাতের শারাব দিনে দেওয়ার
রীতি আমার নাইতো জানা ।।
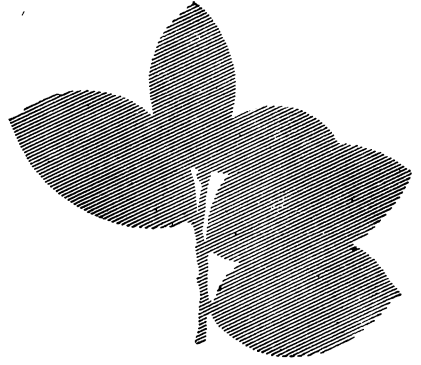
আমার কথা জানেনা কেউ,
জানেনা ঐ জ্যোতির্বিদ,
জানেনা তার তীরের ফলক
কোথায় শিকার ; কোন্ ঠিকানা ॥

নয় প্রতীচীর সন্ধ্যা রঙিন,
রক্ত নদী ঐ দূরে,
ভোরের পানে দেখ চেয়ে
আজ ও কালের শেষ সীমানা ॥

বিশ্ব ধরার স্বভাব থেকে
ছিনিয়ে নিল শক্তি যে,
নয় নিরাপদ বিজ্‌লি শিখায়
এখন যে তার আশিয়ানা ॥

জানি ওদের মৌসুমী আর
নীল দরিয়া, নৌ-বহর,
কেমন করে রুখবে তবু
ভাগ্যলিপির এই বাহানা ॥
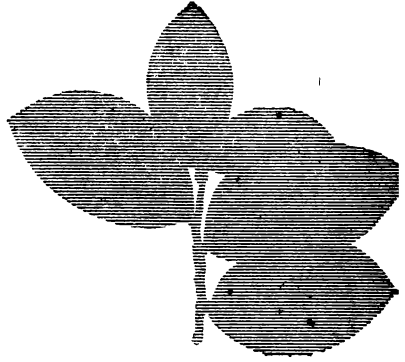
নতুন জাহান উঠ্‌ছে জেগে
মৃত্যুমুখী এই ধরা,
ফিরিঙ্গীদের কারসাজিতে
হ'ল যে হায় খুমারখানা ॥

ঝড় তুফানের মুখে যে জন
জ্বালিয়ে রাখে দীপ শিখা ;
সেই দরবেশ,—বান্দা খোদার
পায় দৌলত শাহিয়ানা ॥
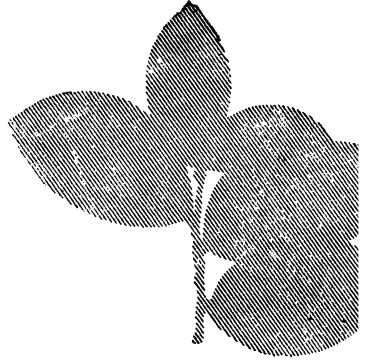
মোনাজাত

যারা করুণার প্রার্থী,—তাদের
মুশকিল তুমি করো আসান
এই অসহায় পিপীলিকাদের
সুলায়মানের করো সমান।

সেই দুর্লভ ঈশকের শিখা
করো তুমি আজ সুলভে দান,
হিন্দের এই মঠবাসী জনে
করো তুমি খোদা মুসলমান।

সঘন বিষাদে বহিছে নয়নে
অঝোর অশ্রু-রক্তধার ;
কোটি খঞ্জরে দীর্ণ হৃদয়
হাহাকার করে ওঠে আবার ॥

পুষ্প-সুরভি ক'রেছে প্রকাশ
গোপন কাহিনী মালঞ্চের ;
হবে বিশ্বাস হন্তা কুসুম !
নেবে কি ভ্রান্ত ভূমিকা ফের !
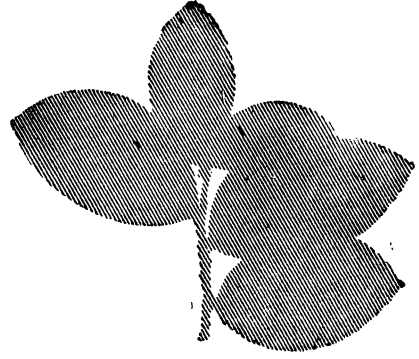
ফুল মৌসুম শেষে দেখি আজ
পড়ে আছে তার বন বীণার ;
বিরান এখন গোলাব কানন
গানের পাখীরা গাহে না আর ।

শুধু গেয়ে যায় সারা দিনমান
বুলবুল এক সঙ্গীহারা ;
সুরে ও বিষাদে পূর্ণ কণ্ঠ
ঢালে হৃদয়ের রক্তধারা ।।

সনুবর শাখা ছাড়িয়া কখন
গীতি বিহঙ্গ গিয়াছে চলি'
ঝরা কুসুমের পাপড়িতে হায়
ছেয়ে গেছে সারা বনস্থলি ।

এ গুলশানের সব গৌরব
সব রীতি হ'ল অপসরণ ;
পত্র-বিরল প্রশাখা যে তার
নগ্নতা হেরি চায় মরণ ।
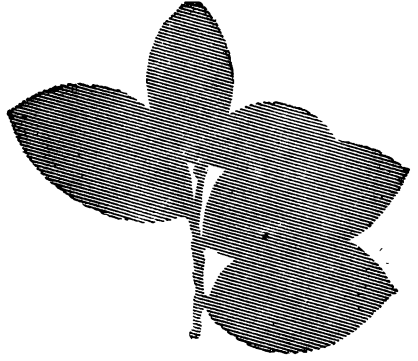
চলমান এই ঋতুর চক্রে
গাহে এক পাখী আপন মনে,
সঙ্গীহীনতা ভুলবে সে যদি
বোঝে কেউ ব্যথা এ ফুলবনে ।।

আনন্দ-হারা জীবন এখানে
মরণ আনে না স্বস্তি আর
দীর্ঘ শ্বাস ভরেছে আকাশ
দেয় প্রশান্তি রক্ত ধার ।

আরশি আমার এ হৃদয় থেকে
চিন্তাধারার জাগে প্রয়াস,
কত উজ্জল স্বপ্নের দল
এ হৃদয়ে মোর চায় প্রকাশ ।।

এ কাননে কেউ বোঝে না আমার
ব্যথা-দীর্ণ এ প্রাণের জ্বালা ;
বেদনা-চিহ্ন যার বুকে
সমব্যথী মোর নাই সে লা'লা ।।
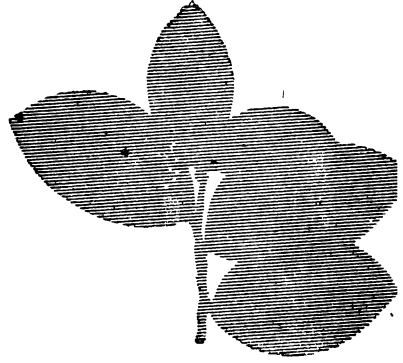
যেন গো দীর্ণ হয় প্রতি মন
এ করুণ গানে বুলবুলের,
বাঙ্গে দারার ভাঙে যেন ঘুম
সব হৃদয়ের— ; মৃত মাঠের ॥

যেন জীবন্ত হয় প্রাণময়
এই সঙ্গীতে সারা নিখিল
প্রাচীন সুরায় তৃষার আবার
জাগে যেন সব পিয়াসী দিল।

আজম দেশের পেয়ালা যদিও
হিজাজী শারাব পাত্রে মোর,
হিন্দের এই গীতিকা তবুও
রয়েছে হিজাজী সুরের ডোর ॥

অশ্বেতর ও সিংহ

সিংহ

মরু আর বনে বসতি যাদের
তুমি তো তাদের গোত্রে নহো,
কে তুমি ? তোমার কোন্ খান্দান
কে তোমার পিতা ? কে পিতামহ ?

অশ্বেতর

আমার মামার সাথে হুজুরের
নাই পরিচয় সম্ভবত
যিনি বাদশাহী আস্তাবলের
গৌরব ; —গতি ঝড়ের মত ।।
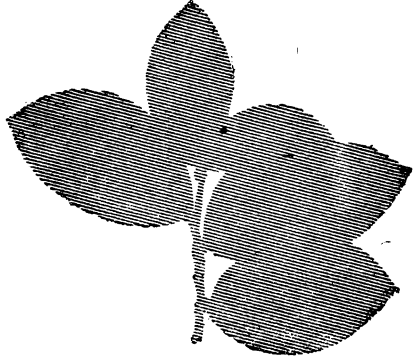
‘শেকোয়া’ থেকে

১

কেন সয়ে যাব এ ক্ষতির পালা

লাভের অঙ্ক নির্বিকার ?

আগামী দিনের বুক ভরে কেন

নেব অতীতের বিষাদ ভার ?

মুগ্ধ শ্রবণ রবে উন্মন

শুন্‌তে কি সুর বুলবুলের ।

নিশ্চুপ কেন রবো চিরদিন ?

ফুল নই আমি মালঞ্চের ।

এই পুষ্পিত বেদনায় আজ

জীবন আমার বাণী মুখর

আল্লাহ্‌র নামে নালিশ আমার

হোক এই মুখ ধূলি ধূসর ॥

২

তোমার বান্দা সেবক নামেই

আমি খ্যাতিমান এই ধরায়

শোনাই তবু এ দুখের কাহিনী

মুক্ত তোমার রাজ-সভায়
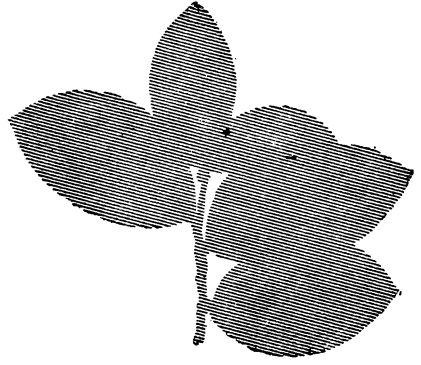
নীরব যদিও হৃদয়-তন্ত্রী
গুমরায় প্রাণ করুণ রবে
যদি ক্রন্দনে আসে গো বাহিরে
ক্ষমা করো দোষ হে প্রভু ! তবে

দেখ অভিযোগ যে এনেছে তার
ভক্তের ছাপ র'য়েছে বুকে
বন্দনা করা রীতি যার প্রভু !
শোন এ নিন্দা তাহারি মুখে

সময়ের পরে তোমার সত্তা প্রভু !
অস্তিত্ব ঘিরে ছিল গুলশান ।
গোলাপ যদিও ছিল মালঞ্চে তবু
সুরভি তখনো হয়নি প্রকাশমান ।

× ×

মন্দিরে বলে মূর্তিরা আজ
ঃ গেল মুসলিম ঈমানদার
তোলে আনন্দ উল্লাস ধ্বনি
গেল চ'লে যদি দ্বারী কাবার ॥

× ×
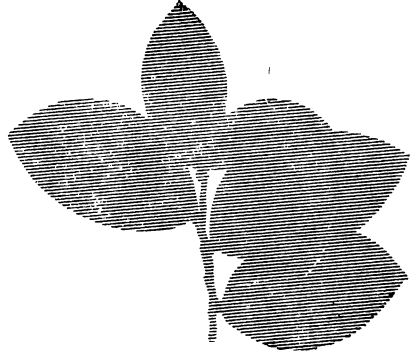
চ'লে গেল তা'রা গাহিত যাহারা
মুক্ত কণ্ঠে হুদীর গান,
চ'লে গেল তা'রা এই অবেলায়
সাথে নিয়ে গেল আল কোরান।

কাফের বে-দ্বীন দেয় টিটকারী
কি ক'রে তোমার প্রাণে তা সয়
তৌহিদ তরে হৃদয়ে তোমার
জাগেনাকি সাড়া বেদনাময় ?

তোমার দুনিয়া মুসলিম ছাড়া
অন্য সবারে চায় যে আজ
স্বপ্নবিলাসী ছিল যে ভুবন
সেই শুধু তোলে ফাঁকা আওয়াজ।।

তবে তাই হোক চ'লে যাই মোরা
আসুক অন্য জাতি ধরায়
চ'লে গেলে তুমি বলোনা আবার
তৌহিদ শিখা নিল বিদায়।

ধরণীর বাস চাহি মোরা যাতে
নাম থাকে তব মহিমাময়
সাকী যদি আর না থাকে তবে
শুধু কি সুরার পাত্র রয় ?

জঙ্গে জিহাদে যুদ্ধের মাঠে
পড়েছি নামাজ হ'লে সময়
কাবা-মুখী সব আহ্‌লে হেজাজ
সিজদাতে শির পেত অভয়

হোক মাহমুদ অথবা আয়ায
দাঁড়ায়েছি মোরা এক কাতার
মানিনি বিভেদ পাশাপাশি থেকে ;
কেবা সুলতান, ফকীর আর !!

জানি নাই দিন, মানিনি রাত্রি
তোমার ধরায় অনবরত
তৌহিদী সুরা বহি অবিরাম
ফিরেছি তোমার সাকীর মত ।
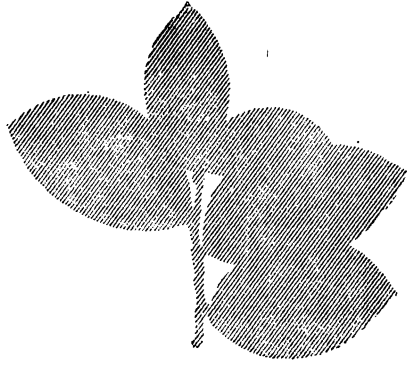
পার হয়ে গেছি মরু বিয়াবান
পার হয়ে গেছি খাড়া পাহাড়
তুমি বলো প্রভু, ব্যর্থতা নিয়ে
আমরা কখনো ফিরেছি আর ?

শুধু জমিনেই নহে তবে শোন
সত্য নিশান বহি' তোমার
অতলান্তিকে ঝাঁপায়ে পড়েছি
চির দুর্জয় ঘোড় সওয়ার

হ'ল দরবার শূন্য তোমার
নিয়াছে বিদায় প্রেমিক যারা।
নিয়াছে বিদায় নিশীথের শ্বাস
প্রথম প্রাতের অশ্রুধারা।

যারা দিয়েছিল হৃদয় তোমারে
নিয়ে গেছে তারা পুরস্কার।[১]

১. ফররুখ আহমদের পাণ্ডুলিপির প্রাথমিক খসড়া থেকে গৃহীত।
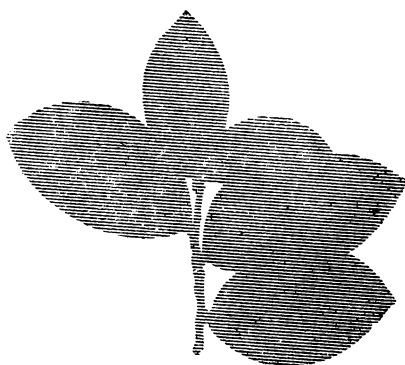
জওয়াব-ই-শিক্ওয়া

অতীতের সেই গরিমার দিন,—শেষ হ'ল তার পালা,
নও বাহারের গৌরব ভার হারায়েছে গুলে লা'লা ।
যখন আশিক ছিল মুসলিম,—প্রেমিক সে আল্লার,
ছিল কি অভাব দরদী দিলের প্রেমের একাগ্রতার ?
মেনে নাও তবে মহান সংজ্ঞা সুদৃঢ় সত্যের
করো প্রতিষ্ঠা নবীর বিধান ;—কানুন আহমদের ॥

o

আজ সুকঠোর জাগরণ তব নব প্রভাতের তীরে
আজ তুমি ভালবাসনা আমারে ভালবাসো সুপ্তিরে,
রমজান মাসে রোজার বিধানে দেখ আজ কঠোরতা !
ব'লো বলো তবে এই কি তোমার প্রেমের একাগ্রতা ?
দৃঢ় বিশ্বাস বৃন্তের 'পরে জাগে কওমের মন
আসমানে তারা নাহি জাগে, যদি না থাকে আকর্ষণ ॥

o

মুহম্মদের সরণি ছাড়িয়া কা'রা হ'ল পলাতক ?
সুবিধাবাদের পন্থা খুঁজিয়া নিল কে প্রবঞ্চক ?
কা'রা হ'ল আজ পর-পদ-লেহী অন্যের অনুসারী ?
পিতৃ-পন্থা ত্যাগী হ'ল কা'রা ভ্রান্তির পথচারী ?
হৃদয়ে তোমার নাই যে বেদনা, নাই আর ভাবাবেগ
মুহম্মদের পয়গামে তব নাই শ্রদ্ধার রেখ ॥
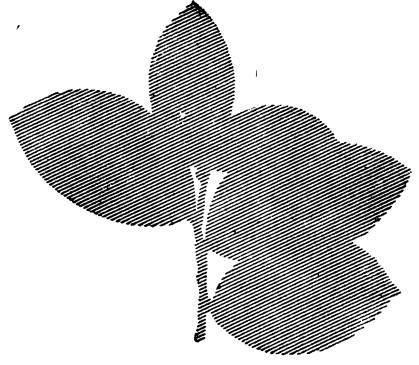
o

মসজিদে শুধু আসে গরীবেরা মোর,
সহিছে গরীব সিয়ামের তৃষা ঘোর,
শুধু গরীবেরা নেয় যে আমার নাম,
বাঁচায় সে আজো পর্দা তোমার ;—পূরায় মনস্কাম।
মাতাল ধনিক ঐশ্বর্যের ডোরে
মত্ত নেশায় ভুলিয়া গিয়াছে মোরে ।।

o

মুফ্‌তী আজিকে হারায়েছে তার প্রজ্ঞার পূর্ণতা,
নাই হৃদয়ের সেই উত্তাপ, নাই বাক মত্ততা,
র'য়েছে আজান, নাই শুধু আর পাক রুহ বিলালের ;
দর্শন আছে, নাই গাজ্জালী—প্রতীক সে মুমিনের।
মস্‌জিদ শোকে মসিয়া পড়ে, নামাজী সেথায় নাই ;
হিজাজী ঈমানদারের চিহ্ন কোথাও খুঁজে না পাই ।।

o

আয়েশ পূজারী! দিন কাটে তব আরাম প্রত্যাশায়,
মুসলিম নামে পরিচয় দাও…এই কি নিশানি…হায়!
নাই হায়দরী তুষ্টি, নাহি যে বিত্ত ওসমানের ;
কোন্‌ সংযোগ রাখো তুমি আজো সে পিতৃপুরুষের ?
কুল মখলুকে ছিল মাননীয়, ছিল যারা মুসলিম।
কোরান ছাড়িয়া পাও শুধু আজ অপমান নিঃসীম ।।

o
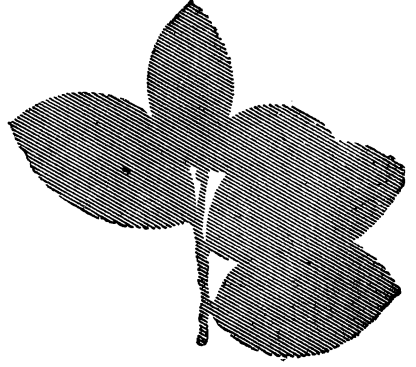
আত্মহন্তা তোমরা, তাদের ছিল যে আত্মজ্ঞান,
ভ্রাতৃত্বের বিরোধী তোমরা, তারা ছিল মহীয়ান,
বাক্য-বিলাসী তোমরা, তাহারা ফিরেছে কাজের টানে,
কুসুমের তরে কাঁদো, তা'রা ছিল নির্লোভ গুলশানে !
সারা দুনিয়ার সব জাতি শোনে তাদের কীর্তি গাথা ;
কালের বক্ষে সেই গৌরব আসন রয়েছে পাতা ।।

o

নিরাশ হয়োনা তবু বাগবান দেখি এ শূন্য পুরী,
আস্‌বে সুদিন সিতারার মত ফুট্‌বে ফুলের কুঁড়ি,
মুছে দিতে হবে শুধু বাগানের সকল আবর্জনা,
শহীদী রক্তে জাগবে কুঁড়িতে ফুট্‌বার মূর্ছনা,
দেখ দিগন্তে রক্ত রঙিন প্রতীচীর অম্বর
উদয়-সূর্য রশ্মির এই রক্তিম স্বাক্ষর ।।

o

নিখিল জাহান জানেনা যে দাম, মূল্য জানেনা হায় !
কুল মখলুক সেই পরিচয় আবার জানিতে চায় ।
তোমার কাকুতি, অনুভূতি, প্রাণ ধরণীর সম্পদ
মখলুকাতের সেরা দৌলত মহীয়ান খিলাফত ।
নাই বিশ্রাম, চেওনা আরাম কর্মের সরণিতে ;
লহ গুরুভার জাগাতে ধরারে ইসলামী দীপ্তিতে ।।
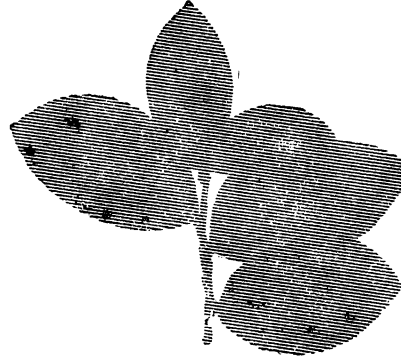
০

জ্ঞানের বর্ম দিয়েছি তোমারে প্রেম তব তরবারি,
মোর দরবেশ লহ খিলাফত ;—হও সুযোগ্য তারি।
আগুনের মত প্রোজ্জ্বল হ'য়ে জাগবে ও তক্‌বীর
হও মুসলিম, তদ্‌বীর তব জানি হবে তক্‌দীর ;
তুমি যদি হও মুহম্মদের প্রেমিক, আমিও তবে
তোমার প্রেমিক হবো ;
দুনিয়াতো ছোট, লওহ কলম দেব আমি তোমাকেই ;
চির দিন আমি তোমার প্রেমিক রবো ৷৷
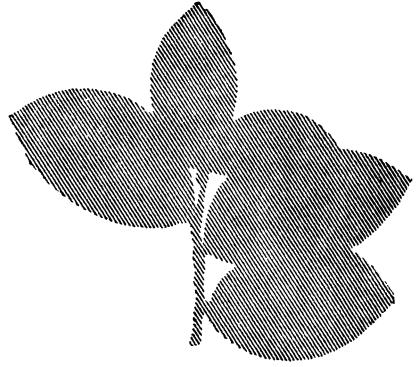
খোদার দুনিয়া

কে তিনি—মাটির নিবিড় আঁধারে লালন করেন বীজ ?
কে তিনি—ওঠান সহজে এ মেঘ দরিয়ার ঢেউ থেকে ?
কে তিনি—আনেন পশ্চিমী হাওয়া, সুফলপ্রসূ এ বায়ু ?
এ জমিন কার ?   অথবা এ কার সূর্য-রশ্মি ধারা ?
মুক্তার মত ফসল করেন শস্যের শীষে জমা।
কার ইঙ্গিতে অনুভূতিময় মাসের পরিক্রমা ?

শোন জমিদার—এ খেত-খামার এ তোমার নয়,
এ তোমার নয়,
এ নয় তোমার কোন সম্পদ ; আমারো এ নয়
কোন সঞ্চয় ।।
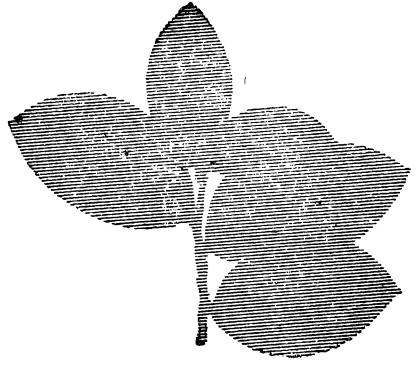
ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক

ব্যক্তি ও সমাজ সত্তা—দর্পণ, সুতা ও মোতি,
ছায়াপথ—নক্ষত্রের মত
সমাজে ব্যক্তির মূল্য, ব্যক্তির সংযোগে থাকে
সমাজের রূপ অব্যাহত,
যখন সমাজ দেহ ব্যক্তি সত্তা লুপ্ত করে অস্তিত্ব নিজের
উধাও সমুদ্রে বক্ষে বারি-বিন্দু রূপ নেয় মহা সমুদ্রের।
সমাজের ভবিষ্যৎ অথবা অতীত মনে ছায়া ফেলে তার ;
সুগঠিত চরিত্রের অধিকারী, তার সত্তা
স্বপ্ন দেখে আগামী উষার।

অশেষ সময় তার, শেষ নাই, সীমা নাই, যুগ চিরন্তন
সমাজের প্রাণাবেগে উর্ধমুখী আত্মা যার খোঁজে উন্নয়ন ;
কাজের হিসাব নেয় বিশাল সমাজ সত্তা
তার কাছে যেন অনুক্ষণ।

সম্পূর্ণ সমাজময় অন্তর বাহির, তার—
দেহ মন সুগঠিত সমাজের ছাঁচে
সমাজের ভাষা থেকে ভাষা পায়
প্রেরণা পায় সে পূর্বপুরুষের কাছে।
সমাজ-সান্নিধ্যে তার গ'ড়ে ওঠে চরিত্রের দৃঢ় বুনিয়াদ,
সমাজের নামান্তর সেই ব্যক্তি হয় নিজে, হয় স্বপ্নস্বাদ,
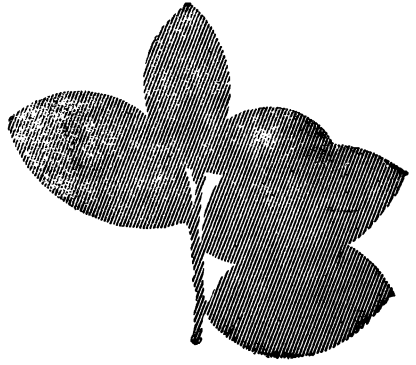
এক হয় শক্তিশালী অনেকের সহযোগিতায়;
একীভূত হ'য়ে জানি অনেক অসংখ্য আত্মা একে রূপ পায়।

একটি কথার গ্রন্থি স্থানচ্যুত হয় যদি
কাব্য রূপ হয় অর্থহীন,
যে পত্র বিচ্ছিন্ন হয় বৃক্ষশাখা হ'তে, আর
পায় না তো ফাল্গুন সুদিন,
মিল্লাতের জমজম—পুণ্য বারি যে মানুষ করে নাই পান
নিষ্প্রভ নিস্তেজ তার অগ্নিকণা চিরদিন মৃত্যুর সমান।

নিঃসঙ্গ যখন ব্যক্তি হয় সে সামর্থ্যহীন
পায়না তো কামিয়াবি—পথের সন্ধান
যখন সমাজ দেয় নীতি ও শৃঙ্খলা তাকে
ভোরের হাওয়ার মত ভারমুক্ত সহজে সে হয় গতিমান।

শমশাদ বৃক্ষের মত মাটিতে নিবদ্ধ মূল তার,
শৃঙ্খলায় বেঁধে তাকে বিশাল সমাজ সত্তা দেয় স্বাধীনতা,
যখন আবদ্ধ হয় নিগড়ে কঠিন শৃঙ্খলার
হরিণীর নাভি মূলে সুরভিত মেশ্‌ক শোনে
অপরূপ তার সৃষ্টিকথা॥
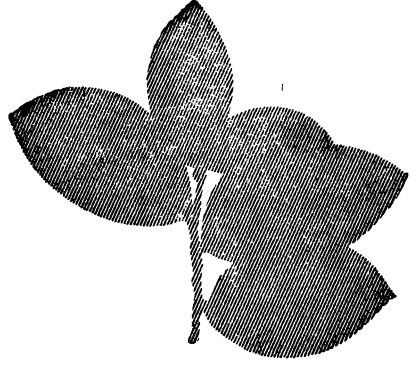
আসরারে খুদী ঃ সূচনা খণ্ড

দুরন্ত দস্যুর মত যখন প্রোজ্জ্বল সূর্য হানা দিল শর্বরীর 'পরে
আমার ক্রন্দন ধারে শিশির-সিঞ্চিত হ'ল গোলাবের মুখ,
নার্গিসের ঘুমঘোর মুছে নিল মোর অশ্রু কণা,
উজ্জীবিত তৃণদল উল্লাসে ছড়ায়ে যায় আমারি সে একাগ্র আবেগে।

আমার বাণীর শক্তি পরখ করিয়া নিল মালঞ্চের মালাকর এসে,
মোর গীতিকার প্রাণ বপন করিল আর তুলে নিল দৃপ্ত তরবারি,
আমার অশ্রুর ধারা ছড়ায়ে গেল সে মালী মৃত্তিকার বুকে
তন্তুর উর্ণার মত অরণ্যের সাথে মোর আর্ত সুর করিল বয়ন।

যদিও কণিকা আমি তবু জানি খরপ্রভা সূর্য সে আমারি,
সহস্র উষার দীপ্তি সংগোপন মোর বক্ষ মাঝে,
জাম্‌শীদের পাত্র হ'তে উজ্জ্বল আমার ধূলি জানে সংজ্ঞা তার
জন্ম যে নেয়নি আজো ধূলিরুক্ষ ধরিত্রী বুকে।
শিকার ক'রেছে মোর চিন্তাধারা সেই হরিণীকে
বাহিরে আসেনি আজো যে এখনো অনস্তিত্ব অন্ধকার থেকে।

সবুজে শ্যামলে মোর মনোহর অরণ্য সুন্দর,
আমার বসন-প্রান্তে সুপ্ত আজো সংখ্যাহীন গোলাব কুঁড়িরা,
নীরব আমার সুরে সম্মিলিত গীতিকার দল।
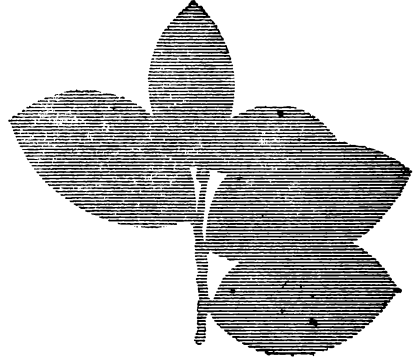
আঘাত দিয়েছি আমি নিখিলের হৃদয় তন্ত্রীতে,
প্রতিভার প্রাণকেন্দ্রে সদ্য বিকশিত এই গীতিকা দুর্লভ
অপরিচয়ের সূত্রে অজানা বিস্ময় আনে সহযাত্রী পথিকের প্রাণে।

তরুণ সূর্যের মত জন্ম মোর এ বিশ্বের বুকে,
আকাশের কক্ষপথ, বিচিত্র এ নভাঙ্গন পরিচিত নহে মোর কাছে.
আমার আলোক স্পর্শে জাগে নাই কক্ষ পথে এখনো তারা-রা,
তাপমান যন্ত্রে মোর চঞ্চল হয়নি আজো পারদ কণিকা,
নৃত্যপরা রশ্মি মোর স্পর্শ করে নাই আজো সমুদ্রের বুক,
স্পর্শ করে নাই আজো ভোরের রক্তাভা মোর পর্বত শিখর;
অস্তিত্বের আঁখি আজো পরিচিত নহে মোর কাছে ;
কম্পিত তনুতে জাগি, ভীত আমি সত্তার প্রকাশে।

প্রাচীর দিগন্ত হ'তে উঠে এল প্রভাতের যে রশ্মি আমার,
সঞ্চিত রাত্রির ঘন অন্ধকার সহজে সে করিল লুণ্ঠন,
একটি শিশির বিন্দু ঠাঁই নিল পৃথিবীর ; গোলাবের বুকে।

তাদেরি প্রতীক্ষা করি শতাব্দীর রাত্রিশেষে জেগে ওঠে যারা.
মোর অন্তরের বহ্নি নেবে যারা এক দিন, কত সুখী ; কত সুখী তারা।
প্রয়োজন নাহি মোর আজিকার মানুষের বিমূঢ় কর্ণের,
আমি বাণী অনাগত যুগের কবির।
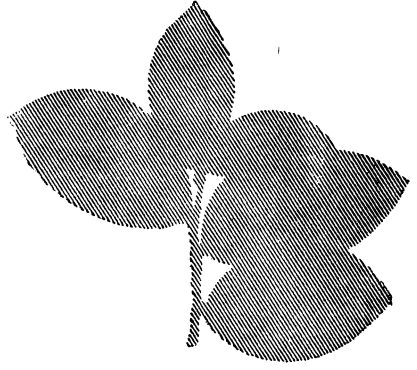
আমার বাণীর গূঢ় রহস্য বোঝে না এই যুগ,
মোর ইউসুফ নয় পণ্য এই মূক বিপণীর,
প্রাচীন সঙ্গীর প্রজ্ঞা হতাশ্বাস ক'রেছে আমারে ;
আমার সিনাই জ্বলে অনাগত ভবিষ্যের মূসার আশায় ।

ওদের বারিধি স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ শিশিরের মত,
আমার শিশির কণা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্র বিশাল,
আমার সংগীত ধারা পরিচিত পৃথ্বি ছেড়ে সীমারেখা টেনেছে নূতন ;
এ বাঁশী ডাকিয়া ফেরে পথহারা শ্রান্তজনে মঞ্জিলের পথের আশ্বাসে ।

কত কবি জন্ম নিল সে মহাকবির মৃত্যু শেষে,
আমাদের রুদ্ধ আঁখি খুলেছিল যে নিজের দৃষ্টির আলোকে ।
মাজারের মৃত্তিকায় যেমন গোলাব কুঁড়ি দীর্ণ করে সুপ্ত পর্ণাধার
নিঃসীম শূন্যতা থেকে নূতন দিগন্ত পানে যাত্রা শুরু হ'ল পুনর্বার ।

অসংখ্য কাফেলা জানি পার হ'য়ে গেছে এই মরু
নিভৃতে,—উটের মত মিশে গেছে তা'রা দূরে শব্দহীন মৃদু পদক্ষেপে

প্রেমপন্থী চিত্ত মোর, এ ক্রন্দন প্রকৃতি আমার,
রোজ হাশরের মত শব্দিত ঝঞ্ঝায় আমি শুনি একা নৈঃশব্দের সুর,
তন্ত্রীর শক্তিকে মোর অতিক্রম ক'রে যায় সুরের উচ্চাশা,
তবুও নিঃশংক আমি এ বীণার দুর্জয় শক্তিতে ।
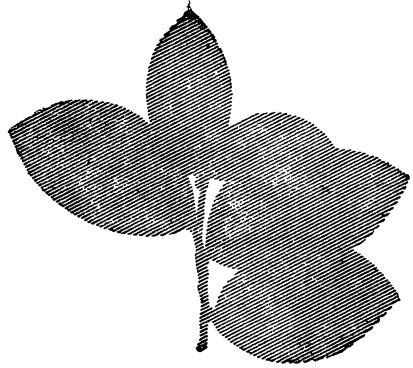
সে বারি বিন্দুর যদি দেখা নাহি হ'ত মোর খরস্রোত সাথে
সেই ছিল ভালো ;
ভয়ঙ্করী রূপ তার হয়তো উন্মাদ ক'রে দেবে এ সিন্ধুকে !
কোনো নদী পারিবে না ধারণ করিতে মোর ওমান দরিয়া,
আমার উদ্দাম বন্যা চাহে আজ নিখিলের সব সিন্ধু, সমুদ্র ফেনিল।

যদি এ কুঁড়ির স্বপ্নে গোলাবের গুলশান না জাগে আমার,
তবে এই ফাল্গুনের মেঘচ্ছায়া মূল্যহীন, কৃপা তার ছায়া ব্যর্থতার।
বজ্র ও বিদ্যুৎ সুপ্ত, সম্মোহিত অন্তরে আমার ;
শিলা আর সমতল পিষে ফেলে ব'য়ে যাই আমি।

যদি তুমি মাঠ হও যুদ্ধ কর তবে মোর সমুদ্রের সাথে,
সিনাই পাহাড় যদি, তবে তুমি নাও মোর বিদ্যুৎ বিভাস,
আব-হায়াতের আমি অধিকারী, প্রাজ্ঞ আমি জীবনের গূঢ় রহস্যের,
মোর অগ্নি গীতি হ'তে করিয়াছে ধূলিতল জীবন-সঞ্চয়,
বিস্তার ক'রেছে পক্ষ ঘনতর অন্ধকারে দীপ্তিময়ী স্ফুলিঙ্গের মত।

যে কথা জানাবো আমি খোলেনি কখনো কেউ সে অজ্ঞাত
রহস্যের দ্বার,
চিন্তার দুর্লভ মুক্তা গাঁথিতে চাহেনি কেউ আমার মতন !
চিরন্তন জীবনের গূঢ় বার্তা যদি তুমি জেনে নিতে চাও
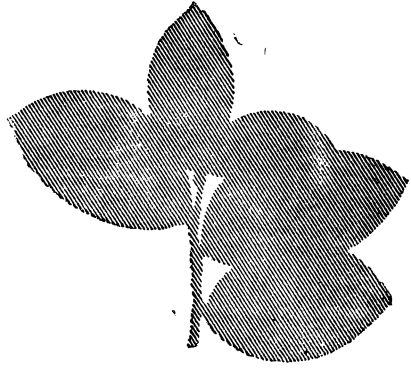
তবে তুমি এস,
আকাশ, মৃত্তিকা যদি জয় ক'রে নিতে চাও তবে এস তুমি !
বন্ধহারা যে আকাশ সেই শুধু এই গান শেখায় আমারে ;
এ গানের সুরজাল ঢাকিতে পারি না আমি বন্ধুর দুয়ারে।

ওগো সাকী ! ওঠ, ওঠ ঢালো পাত্রে রঙিন শারাব,
কালের ভ্রূকুটি তুমি স্তব্ধ ক'রে দাও মোর অন্তর্লোক থেকে।
জমজমের ধারা হ'তে ভেসে আসে যে সুরা উজ্জল,
সে সুরার পূজারী যে বিত্তশালী চিরদিন সম্রাটের মত।
চিন্তাকে সে ক'রে তোলে আরো স্থির, আরো প্রজ্ঞাময়,
তীক্ষ্ণ আঁখি ক'রে তোলে তীক্ষ্ণতর আরো,
তৃণকে সে দান করে পর্বতের ভার ;
সিংহ-শক্তি দেয় সে শিবারে।

ধূলিকণা তুলে নেয় সাত সিতারার মাঝে, বারি বিন্দু স্ফীত হয়
সমুদ্রের মত,
রোজ হাশরের মত কোলাহল মাঝে আনে গূঢ় নিস্তব্ধতা ;
তিতিরের পদতল রাঙায় সে ঈগল শোণিতে !
ওঠ, ঢালো স্বচ্ছ সুরা মোর পেয়ালায়,
আমার চিন্তার কৃষ্ণ শর্বরীর বুকে তুমি এনে দাও চন্দ্রালোক আজ,
যেন নিয়ে যেতে পারি ভ্রাম্যমান জনতাকে মঞ্জিলে আমার,
তীব্র প্রাণ-চঞ্চলতা দিতে পারি যেন এই জড়তার বুকে,

উদ্যত উৎসাহে যেন যেতে পারি নবীনের দৃপ্ত অভিযানে ;
পরিচিত হ'তে পারি নূতনের অগ্রগ্রামী রূপে।

আঁখি তারকার মত হ'তে পারি দৃষ্টিমান মানুষের কাছে,
বিশ্বের শ্রবণে যেন যেতে পারি আমি সুর হ'য়ে,
কাব্যের সুষমা যেন পরম ঐশ্বর্যময় হয় লেখনীতে ;
আমার কান্নায় যেন জেগে ওঠে শুষ্ক তৃণ অশ্রুসিক্ত ; প্রাণের প্রান্তরে।

রুমীর প্রতিভা দীপ্তি উদ্দীপিত ক'রেছে আমাকে,
রহস্যের গ্রন্থ হ'তে আজ আমি গেয়ে যাই গান,
আত্মা তাঁর অগ্নিকুণ্ড, জ্বলন্ত, উজ্জ্বল,
আমি শুধু অগ্নিকণা প্রাণ পাই মুহূর্তের তরে।
পতঙ্গের মত মোরে গ্রাস করিয়াছে তাঁর দীপ্ত অগ্নিশিখা,
আমার পেয়ালা পূর্ণ করিয়াছে কানায়, কানায়,
স্বর্ণ মহিমায় মোর মৃত্তিকারে ফেরায়েছে রুমী,
প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড ক'রেছে সে মোর বিভূতিরে,
সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, বিভা কেড়ে নিতে বালু কণা উঠে এল মরুভূমি থেকে।

পথিক তরঙ্গ আমি তাঁর সমুদ্রের বুকে ফিরে আসি বিশ্রাম আসায়,
ফিরে আসি তুলে নিতে মুক্তা খণ্ড তাঁর,
দীউয়ানা মাতাল আমি মত্ত তাঁর সুরের সুরায় ;
জীবন সঞ্চয় করি তাঁর বাণীমূলে।
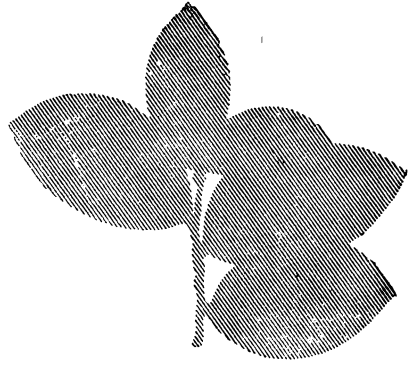
তখন অনেক রাত্রি।—বেদনায় পরিপূর্ণ হৃদয় আমার
আল্লার দরবার মাঝে তুলেছিল তিক্ত ফরিয়াদ,
ব্যথাতুর বিশ্বমাঝে পানপাত্র শূন্য দেখে উঠেছিল আমার বিলাপ
তারপর ঘুমঘোরে ক্লান্ত চক্ষু ডুবে গেল দুঃসহ ব্যথায়।
অকস্মাৎ সত্যদ্রষ্টা সে নরের হ'ল আবির্ভাব,
সত্য উপাদানে যিনি লিখিলেন ফোরকান ইরানী ভাষায়,
মোরে বলিলেন তিনি, "উন্মত্ত প্রেমিক!

পান কর প্রেমের শারাব,
হৃদয় তন্ত্রীতে হানো কঠিন আঘাত।
তোল তুমি সীমাহীন সে উদাত্ত সুর,
সুরা পাত্রে ফেলে দাও মস্তক আপন,
আঁখি তব দাও অস্ত্রমুখে,
ব্যথিত শ্বাসের উৎস কর আজ মৃদু হাসি তব;
তোমার অশ্রুর রঙে হোক আজ রুধিরাক্ত মানুষের বুক।

"নীরব কুঁড়ির মত কত দিন জাগিবে একাকী,
সুরভি বিস্তার কর গোলাবের মতন সহজে।
নিস্পন্দ রসনা তব জীবনের গভীর ব্যথায়,
নিজেকে নিক্ষেপ কর অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধনের মত,
নীরবতা ভঙ্গ কর ঘন্টা-ধ্বনি সম,
কান্নার সহস্র সুর উচ্চারণ কর তুমি প্রতি অঙ্গ হ'তে।
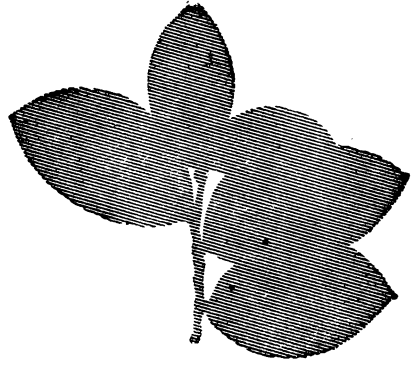
অগ্নি তুমি লেলিহান পরিপূর্ণ কর বিশ্ব তোমার আভায়,
দগ্ধ কর পৃথিবীকে নিজের দহনে।
রহস্য জানায়ে দাও সে প্রাচীন সুরা বিক্রেতার,
সুরার তরঙ্গ হও, স্বচ্ছ হোক তোমার বসন।
ভয়ের আরশি তুমি ভেঙে ফেলো বিপণীর মাঝে,
ভেঙে ফেলো সুরার পেয়ালা,
নলের বাঁশীর মত বাণী নিয়ে এস তুমি নলবন থেকে,
লায়লার দ্বার থেকে আনো তুমি বার্তা মজনুর,
নতুন সুরের ধারা সৃষ্টি কর তোমার সঙ্গীতে ;
উদাত্ত উৎসাহে আজ জনতারে কর বিত্তবান।

"হে আশিক ! ওঠ, জাগো,
আবার প্রেরণা দাও জীবিত আত্মারে,
উচ্চারণ কর তুমি নবীন জাগৃতি ;
বাণীর যাদুতে তব জাগুক জীবন্ত আত্মা কুল।
হে পথিক ! ওঠ, ওঠ,
অন্যতর পথে তুমি কর পদক্ষেপ,
দূর কর অতীতের একটানা ক্লান্ত ঘুমঘোর,
পরিচিত হও তুমি সংগীতের আনন্দের সাথে ;
ওগো কাফেলার ঘন্টা, ওঠ, জাগো তুমি।"
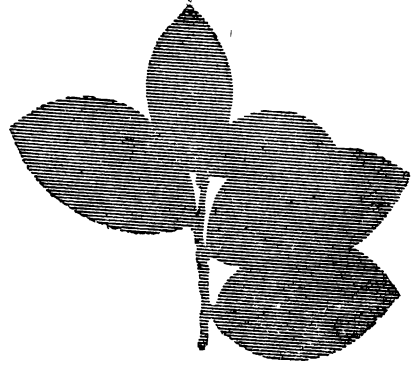
সে বাণীর প্রেরণায় বক্ষ মোর হ'ল উদ্ভাসিত
সুঠাম বাঁশীর মত স্ফীত হ'ল সুরের জোয়ারে,
সংগীত তন্ত্রীর মত অকস্মাৎ উঠিলাম জেগে
মানব প্রকৃতির তরে প্রস্তুত করিতে এক জান্নাৎ নূতন।

তুলিয়া দিলাম সব যবনিকা আত্ম-রহস্যের,
গোপন সংবাদ তার বিশ্বময় দিলাম ছড়ায়ে !
অসমাপ্ত সত্তা মোর অসুন্দর, ছিল মূল্যহীন ;
প্রেম দিল পরম পূর্ণতা !
লভিলাম পরিপূর্ণ মানুষের রূপ,
বিশ্বপ্রকৃতির জ্ঞান ভিড় ক'রে এল বক্ষ মাঝে ।

দেখিয়াছি আকাশের গতিমান স্নায়ুর স্পন্দন,
চাঁদের শিরায় আমি দেখেছি শোণিত বহমান।
এ জীবন রহস্যের যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে দিতে,
প্রকৃতির জ্ঞানাগারে জেনে নিতে জীবনের গঠন কৌশল
ক্রন্দন ক'রেছি আমি দীর্ঘ রাত্রি মানুষের লাগি' ;
নিরন্ধ্র রাত্রির বক্ষে ছড়ায়েছি চাঁদের সুষমা।

ভক্তিনত আমি শুধু এক সত্য ধর্মের নিকটে,
পরিচয় আছে যার সংখ্যাহীন পর্বত প্রান্তরে ;
অমর সুরের অগ্নি জ্বালায়ে যায় সে নিত্য মানুষের হৃদয়ের মাঝে ।
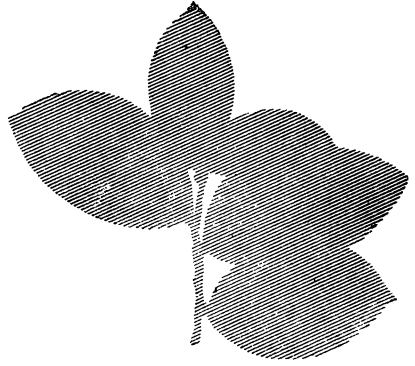
ক্ষুদ্র এক পরমাণু ক'রেছিল সে কভু বপন
পরিপূর্ণ সূর্য এক তুলে নিয়ে গেল অবশেষে ;
রুমী, আত্তারের মত ফসল রাখিল তার সংখ্যাহীন কবি ।

আমি এক দীর্ঘশ্বাস উঠে যাব অন্তহীন নভঃনীলিমায়,
আমি শুধু ধূম্র তবু জ্বালাময় অগ্নি হ'তে আমার উত্থান !
সমুচ্চ চিন্তার স্রোতে ঊর্ধায়িত লেখনী আমার
প্রকাশ ক'রেছে সেই অন্তহীন রহস্য বিপুল,
যবনিকা অন্তরালে সংগোপন, ছিল যে লুকায়ে
যেন এক বিন্দু হয় সীমাহীন সমুদ্রের মত ;
বালুকণা হয় যেন বাঁধমুক্ত সাহারা বিশাল ।

মোর মস্‌নভীর দৃষ্টি নহে শুধু কবিতা সৃষ্টির,
রূপ-উপাসনা আর প্রেম-সৃষ্টি লক্ষ্য নয় তার,
আমি ভারতের কবি, আধেক চাঁদের মত
মোর পাত্র অপূর্ণ আজিও !
ভাবের দুরূহ যাদু চেয়োনা আমার কাছে,
চেয়োনা আমার কাছে খানাসাব আর ইস্পাহান,
জানি ভারতীয় ভাষা সুমধুর ইক্ষুর মতন ;
তবুও মধুরতর ইরানের সুন্দর জবান ।
উজ্জ্বল সৌন্দর্যে তার ভাবাবিষ্ট আমার হৃদয়,
জ্বলন্ত কুঞ্জের মত রূপে তার পল্লবিত হ'ল এ লেখনী,
হে সুধী ! দিয়োনা দোষ মোর দীন সুরাপাত্র দেখে ;
তৃষিত অন্তর দিয়ে নাও শুধু এ সুরার স্বাদ ।।
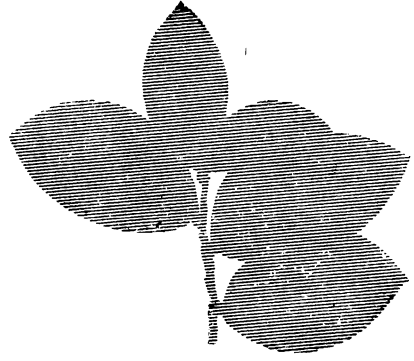
ভিক্ষা

সিংহের নখর থেকে কর নিত এক দিন দুঃসাহসী যারা
ধূর্ত শৃগালের রূপে বিবর্তিত ; নিঃস্ব আজ তা'রা ।

নৈরাশ্যের এ সঙ্গীত, দারিদ্র্যের তিক্ত ফল উৎসমুখ এই বেদনার ;
এ ব্যাধি নেভায়ে দেয়
সমুজ্জ্বল শিখা উচ্চাশার ।

অস্তিত্বের পাত্র থেকে পান কর পানীয় রক্তিম,
কালের ভাণ্ডার থেকে কেড়ে নাও ঐশ্বর্য নিঃসীম,
উটের হাওদা ছেড়ে নেমে এস উমরের মত !
ঋণগ্রস্ত হ'য়ে তুমি কারো কাছে হোয়োনাকো নত ।

আর কতকাল তুমি গোলামীর দেখবে স্বপন ?
নলের উপরে তুমি উঠে যেতে চাবে আর
কতকাল শিশুর মতন ?

যে শুধু তাকায়ে থাকে আকাশের পানে প্রত্যাশায়
ভিক্ষার দীনতা নিয়ে নেমে যায়, আরো নেমে যায়,
ভিক্ষায় প্রকাশ করে দীনতার বীভৎস স্বরূপ,
দীনতর ক'রে তোলে ভিক্ষুকের সর্বহারা রূপ ;
রূহের সিনাই থেকে কেড়ে নেয় আলোক প্রোজ্জ্বল ।
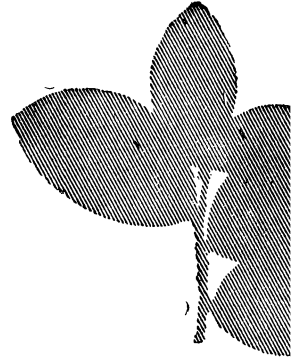
দারিদ্র্যের তিক্ত জ্বালা করিয়াছে তোমারে বিহ্বল।
চেয়োনা ভিক্ষার অন্ন,—মুখাপেক্ষী হয়োনা কৃপার
চেয়োনা সূর্যের কাছে বারি বিন্দু ক্লান্ত পিপাসার,
রোজ হাশরের মাঠে নবীজীর কাছে তুমি হয়োনা লজ্জিত,
ভিখারী আত্মার মত হয়োনা বিবর্ণ, প্রকম্পিত।

সূর্যের সঞ্চয় থেকে মুখাপেক্ষী চাঁদ নেয় জীবিকা আপন,
করুণা-কলংকে তাই কলংকিত চিরদিন চাঁদের জীবন।

শক্তি ও সাহস চাও সর্বশক্তিমান পাক দরবারে আল্লার,
দুরূহ ভাগ্যের সাথে যুদ্ধ তুমি কর দুর্নিবার,
দ্বিনের গৌরব তুমি নামায়ো না টেনে ধূলিতলে।
মূর্তি-আবর্জনা-মুক্ত কা'বা যার শ্রমের বদলে
মনে রেখ তাঁর বাণী, মনে রেখ ওগো সাবধানী,
"আল্লার অশেষ প্রেম নির্ধারিত তার তরে জানি
যে নিজে সংগ্রহ করে আহার্য সঞ্চয় তার সর্ব শ্রম মানি।"
ঘৃণ্য সেই মুখাপেক্ষী অন্যের করুণা-প্রার্থী জন
কপর্দক বিনিময়ে কৃপার আগুনে হায় যে করে সম্মান সমর্পণ।

সুখী সে স্বাধীনচেতা, রৌদ্রদগ্ধ, চাহে না তবুও
আব-হায়াতের পাত্র কোন দিন খিজিরের কাছে,
অশ্রুসিক্ত নহে যার আঁখি পাতা; নাই যার
দীনতার তিক্ত অন্তর্জ্বালা;
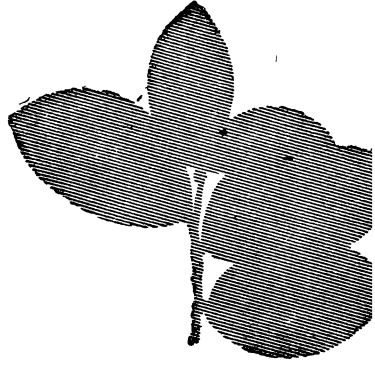
সে নহে মৃত্তিকা খণ্ড!
সে পূর্ণ মানব—শুধু তারি তরে সম্মানের ডালা।
মহান তারুণ্য তার উর্ধশির তরুর মতন
আল্লার আরশ তলে সম্মানিত হয় সর্বক্ষণ।
সে রিক্ত? তবু সে জেনো আত্মার আলোকে দীপ্ত, পূর্ণ, শক্তিমান!
ক্ষয়িষ্ণু সঞ্চয় তার? তবু জেনো সবচেয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ তার মুক্ত প্রাণ।

একটি সমুদ্র যদি ভিক্ষায় সঞ্চয় কর বহ্নি বন্যা পাবে শুধু তাতে,
একটি শিশির-বিন্দু অশেষ মাধুর্যময়
যদি সে অর্জিত হয় আপনার হাতে।
সমুদ্রের মাঝে রাখো জল-বুদ্বুদের মত
অধঃমুখ পেয়ালা তোমার,
হও তুমি সম্মানিত মহান মানব, আর
হও তুমি সম্মানিত খলিফা আল্লার ।।
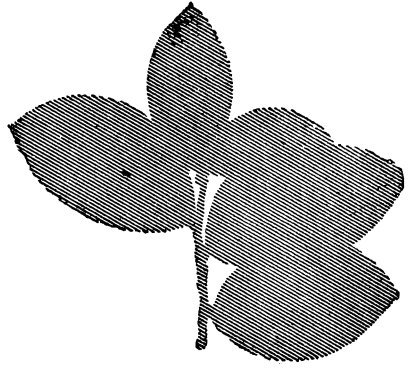
আকাঙ্ক্ষা

আতপ্ত রক্তের ধারা প্রবাহিত করে দেহে আকাঙ্ক্ষার কণা,
বাসনার দীপাগ্নিতে মৃত্তিকা-তনুতে জাগে আলোর মূর্ছনা,
বাসনার তীব্রতায় এ জীবন পান পাত্র পরিপূর্ণ কানায় কানায় ;
চঞ্চল জীবন ধারা গতির প্রবাহ খোঁজে বাসনার দীপ্ত প্রেরণায়।
পরম বিজয়ে শুধু পূর্ণ বনি আদমের অতৃপ্ত জীবন,
বাসনার মর্মমূলে মানুষের জয় বার্তা খোঁজে আকর্ষণ।
জীবন শিকারী এক, আকাঙ্ক্ষার মাঠে তার ফাঁদ ;
সুন্দরের কাছে আনে আকাঙ্ক্ষা প্রেমের সুসংবাদ !

জীবন গীতির সুর বাসনার কেন্দ্রে জাগে !
কেন ? কি কারণে ?
যা কিছু সুন্দর, শ্রেয়—জানায় পথের বার্তা বিভ্রান্ত, বিজনে।
তোমার অন্তর মাঝে অহর্নিশি আঁকে মূর্তি তার,
তোমার অন্তর মাঝে সৃষ্টি করে বহ্নি আকাঙ্ক্ষার,
সুন্দর করিছে সৃষ্টি বাসনার সম্পূর্ণ জোয়ার,
প্রকাশের মুক্ত ছন্দে অগ্নিশিখা জ্বলে আকাঙ্ক্ষার ;
কবির অন্তর মাঝে নেকাব তুলিয়া নেয় সে চির সুন্দর,
সিনাই পাহাড় থেকে সৌন্দর্যের তীব্র দ্যুতি পাঠায় খবর ;
দৃষ্টিতে সুন্দর তার নিমেষে সুন্দরতর, প্রিয়তর অপূর্ব যাদুতে !
বুলবুল শিখেছে গান অফুরন্ত তার ওষ্ঠপুটে,
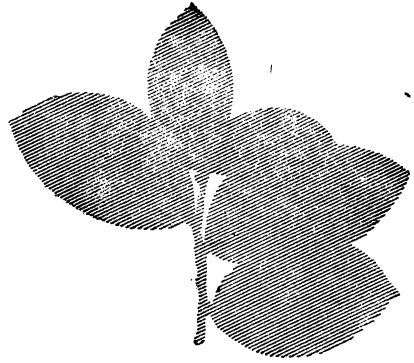
গোলাবের রক্তাধর বর্ণে তার হ'য়েছে উজ্জল,
তার অনুরাগে জ্বলে পতঙ্গের প্রেমী বক্ষতল,
প্রেম কাহিনীর পটে সেই তো জাগায় রঙ সুতীব্র উজ্জল।

সমুদ্র পৃথিবী এই সংগোপন মাটি ও পানিতে,
শতেক তরুণী বিশ্ব সংগোপন আছে তার অন্তর নিভৃতে।
মননের মরু মাঠে ফোটেনি যখন ফুল জীবনের অজানা প্রহরে
আনন্দ ব্যথার গান শোনেনি তখন কেউ সুরহারা নির্জন প্রান্তরে।

তার সুরজাল হেথা ব'য়ে আনে মোহময় যাদু অপরূপ,
একটি কেশের সাথে টেনে আনে পর্বতের সমগ্র স্বরূপ,
চাঁদ সিতারার সাথে চিন্তার সহস্র বিশ্ব পাড়ি দেয় একা,
জানে না কুরূপা পৃথ্বি ; সৃষ্টি করে এ সৌন্দর্য লেখা।

আব-হায়াতের প্রার্থী ভ্রাম্যমান সে এক খিজির!
সুচির-তিমির-গর্ভে আছে তার শ্রেষ্ঠ কাম্য নীর,
নীরব অশ্রুতে তার প্রাণবন্ত অস্তিত্বের তীর।

মৃদুগতি চলি মোরা অনভিজ্ঞ নূতন যাত্রিক,
পায়ে পায়ে প'ড়ে যাই স্খলিত পথের মাঝে বিভ্রান্ত পথিক,
সংগীতের সম্মোহনে ভোলায়েছে আমাদের পথে বুলবুল,
পেতেছে কুহক মায়া, অনন্ত পথের দিশা ক'রে দিতে ভুল,

৫—
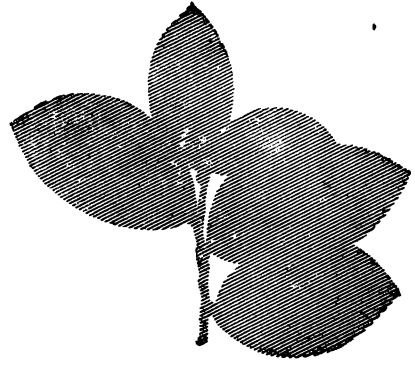
যেন সে চালাতে পারে প্রাণ-উষ্ণ জান্নাত্ ভূমিতে ;
জীবনের ধনু যেন পূর্ণ চক্ররূপ নেয় সে মুগ্ধ শোণিতে ।

কাফেলা সম্মুখে চলে মৃদু ঘন্টা ধ্বনি তুলে, দূরে বাঁশী বাজে,
যখন মরুর হাওয়া ব'য়ে যায় মৃদু গতি
পথ খোঁজে গোলাবের মর্মগ্রন্থি মাঝে,
তার যাদু স্পর্শে জাগে জিজ্ঞাসা-চঞ্চল এ জীবন,
এ বিশ্বের জনতারে তার মহফিল মাঝে অনায়াসে করে আমন্ত্রণ !
সুলভ হাওয়ার মত হেলাভরে দিয়ে যায় অফুরন্ত প্রাণ-শক্তি তার ।

সেদিন ঘৃণিত জাতি মৃত্যুর সম্মুখে শ্রান্ত
রেখে যায় জীবন সম্ভার ;
ঘৃণিত তাদের কবি বিলুপ্ত করে যে এসে
জীবনের আনন্দ অপার ।

* * *

কাব্যের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে
যাচাই করিয়া নাও জীবনের পরীক্ষা পাথরে,
চিন্তার উজ্জল দীপ্তি জীবনে দেখায় পথে কর্মের প্রহরে ;
বিদ্যুৎ-চমক জানি অগ্রগ্রামী আসন্ন বজ্রের ।
কাব্য সৃজনের মাঠে দিতে পারে শক্তি সে যোগ্যের,
আরবের মৃত্তিকায় ফিরে যেতে দেয় সে যোগ্যতা ।
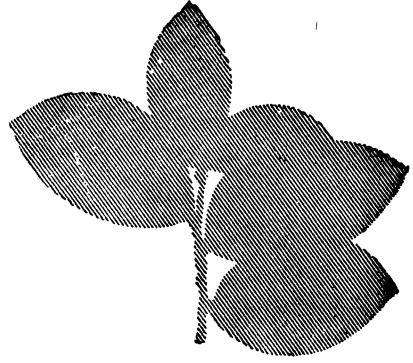
অন্তরে আঁকিয়া নিয়ো সাল্‌মা আরাবীর পুণ্য কথা
হেজাজের উষা যেন জাগে "কূর্দ" শর্বরীর ক্লান্ত মধ্যভাগে।
গোলাব তুলেছো তুমি ইরানের শত গুলবাগে,
দেখেছো ইরানে, হিন্দে অপরূপ সৌন্দর্য-বিথার,
মরুভূর খরোত্তাপ অনুভব কর একবার!
প্রাচীন খর্জুর সুরা একবার কর তুমি পান,
তোমার শিয়রে তার তপ্ত বক্ষ হোক উপাধান,
সমর্পণ কর তনু আজ তার উত্তপ্ত হাওয়ায়।
রেশম-বিলাসী তুমি, ঠাঁই নাও অমসৃণ কার্পাস শয্যায়।

পুষ্পের কোমল পর্ণে নৃত্য করিয়াছ তুমি বংশ পরম্পরা,
কোমল শিশিরে ওষ্ঠ সিঞ্চন ক'রেছ তুমি ওগো রক্তাধরা,
জ্বলন্ত বালুর পরে ছুঁড়ে ফেল আজ আপনারে,
ডুবে যাও, ডুবে যাও জমজমের পুণ্য উৎস ধারে।
বুলবুলের মত তুমি কেঁদে যাবে কত কাল কান্না ব্যর্থতার?
কত কাল রবে তুমি বিলাসী বাসিন্দা বাগিচার?

* * *

বাঁধো নীড় পর্বতের উন্নত শিখরে,
বিদ্যুৎ-বজ্রাগ্নি ঘেরা সুদুর্গম উচ্চতার শীর্ষে বাঁধো নীড়,
ঈগলের নীড় ছেড়ে আরো উর্ধে আরো উর্ধ স্তরে,
যেন যোগ্য হ'তে পারো জেহাদের—এই জিন্দেগীর;
তোমার তনু ও আত্মা দগ্ধ হ'তে পারে যেন
এই প্রাণ-বহ্নি'র উপরে ॥

ঈমান
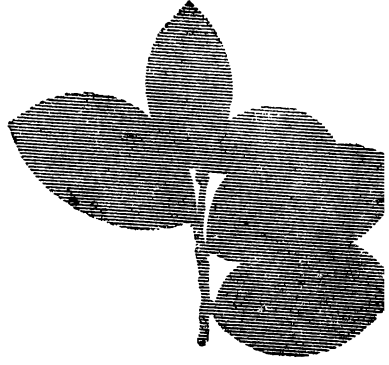
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লার' রশ্মি আছে বুকে যতক্ষণ
পারবে সহজে তুমি পিষে যেতে অনায়াসে সকল ভীতির আক্রমণ।
নিষ্কম্প আত্মার মত আল্লাতে বিশ্বাস যার পরিপূর্ণ তনুর মাঝারে,
হয় না সে নত শির, হয় না সে ভ্রস্ত কোন বিভ্রান্ত শক্তির অহঙ্কারে!
পত্নী আর সন্ততির মোহ থেকে মুক্ত সেই জন
সংযত, খোদার রাহে পারে সে কোরবানী দিতে পুত্রকে আপন।
হয়তো সে সংগীহীন, শক্তিমান তবুও সে পূর্ণ এক বাহিনীর মত,—
মূল্যহীন তার কাছে প্রশ্বাস বায়ুর চেয়ে জিন্দেগানী মুক্ত আনাহত॥
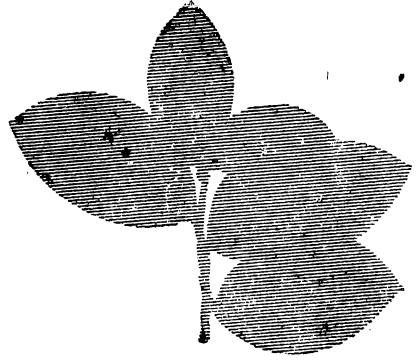
শৃঙ্খলা

সুরভিত হয় বায়ু বন্দী হ'লে কুসুমের বুকে,
সুরভিত হয় মেশ্‌ক বদ্ধ হ'য়ে নাভিমূলে কস্তুরী মৃগের,
আকাশে সিতারা চলে প্রাকৃতিক বিধানের নীচে নতমুখে
জেগে ওঠে তৃণদল মেনে পন্থা ক্রমবর্ধনের।
অশেষ দহনে জ্ব'লে আলোক বিলায়ে চলা ধর্ম প্রদীপের,
শিরায়, শিরায় চলা নৃত্যপরা ধর্ম শোণিতের,
ঐক্যের বিধানে ক্ষুদ্র বারিবিন্দু হয় এক সমুদ্র উত্তাল,
ঐক্যের বিধান মেনে ক্ষুদ্র বালুকণা হয়
অন্তহীন সাহারা বিশাল।
আইনের আনুগত্য যদি আনে এইভাবে শক্তি অফুরান,
শক্তির উৎসকে তবে কেন কর অবহেলা ক্লান্ত, ভীরু প্রাণ॥
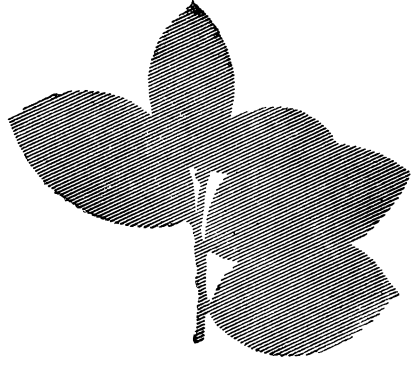
মর্দে মোমিন

নেমে এস তুমি আজ অদৃষ্টের আরোহী—সওয়ার ।
নেমে এস দীপ্ত শিখা যুগান্তের, – পরিবর্তনের ;
দীর্ণ ক'রে যাও তুমি আমার সঘন অন্ধকার ;
আলোকিত ক'রে তোল দৃশ্য অস্তিত্বের ।
স্তব্ধ ক'রে দাও তুমি সমস্ত জাতির কোলাহল,
জান্নাতের মাধুরিতে উঠুক সম্পূর্ণ হ'য়ে
সুরধারা,—মুক্ত ; প্রাণোচ্ছল ।

ওঠ, জাগো মুক্ত প্রাণ আবার বাজায়ে যাও
সুমহান ভ্রাতৃত্বের সুর,
প্রেমের সে পাত্র দাও ফেরায়ে সবার হাতে
(সুরার সুরাহি ভরপুর),
প্রশান্তির দিন ফের ব'য়ে আনো পৃথিবীতে আর একবার ;
শান্তি বাণী নিয়ে যাও যুদ্ধকামী মানুষের জীবনে আবার !
সমগ্র মানব জাতি শস্যক্ষেত্র যেন আর তুমি তার পূর্ণাঙ্গ ফসল.
জীবন যাত্রার পথে সংখ্যাহীন কাফেলার মঞ্জিল ;—তুমি সে লক্ষ্যস্থল ।
হৈমন্তী শাসনে ঝরা পত্র দলে এস তুমি বসন্তের মত,
নিয়ে যাও আমাদের প্রেম প্রীতি হৃদয়ের,—মুক্ত, অনাহত ।
যে সম্মান আমাদের সে শুধু তোমারি ঋণ ওগো অন্যমনা !
নীরবে আনত মুখে ব'য়ে যাই আজ মোরা
জীবনের ব্যথা ও বেদনা ।।

কণিকা

ধর্ম্ম কি জানো ?
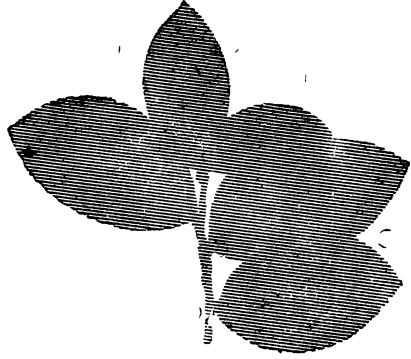
—মৃত্তিকা থেকে উত্থান !

যেন এ আত্মা খুঁজে পায় তার সত্তার সন্ধান ॥

*

কর উন্নত সত্তা এমন

যেন তক্‌দির লেখার আগে

শুধান আল্লা বান্দাকে : বল

কি বাসনা তোর হৃদয়ে জাগে ॥

*

খোদায়ী প্রেমের আলোকে যখন

খুঁজে পায় নর সত্তা ফের,

শাহানশাহীর রহস্য যত

তখনি তো ভাসে দুই চোখে

গোলামের ॥

*

শোন হুঁশিয়ার পান্থ সুজন

তোমার চলার পথে গো যদি

গুলশান থাকে, হও শবনম ;

সাহারা থাকিলে তুফান হও ॥

*

দুর্বার তরঙ্গ এক ব'য়ে গেল তীর-তীব্র বেগে,
ব'লে গেল ঃ আমি আছি, যে মুহূর্তে আমি গতিমান,
যখনি হারাই গতি সে মুহূর্তে আমি আর নাই ॥

*

জরাজীর্ণ এ আকাশ, পুরাতন এ সব তারা-রা,
আমি শুধু চাই তারে সদ্যজাতা যে পৃথ্বী নূতন ॥

*

হারালো যখন ধর্মাবরণ
একতা কোথায় রহিল হায় !
ঐক্যসূত্র গেল যদি ভাই
মিল্লাৎ সাথে নিল বিদায় ॥

*

হারায় গরিমা ; সম্মান;—জাতি আকাশ খিলান তলায়,
হারায় যখন সে আত্মজ্ঞান ধর্মে ; কাব্যকলায় ॥

*

জীবন যেখানে ক্ষীণ স্রোতা নদী গোলামীর ছোঁওয়া লেগে,
আজাদীর মাঠে সেথা সীমাহীন সমুদ্র ওঠে জেগে ॥

*
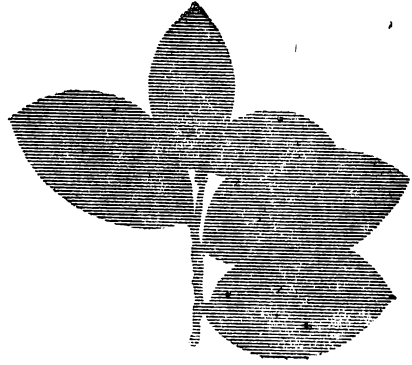
বিশ্বাসহীন কাফের যে দীন বিশ্বে হয় সে হারা,
মুমীনের মাঝে হারায় নিখিল জগতের প্রাণধারা ।।

*

বসন তোমার হয়নি মলিন
স্বদেশ-ধূলিতে অপরিসর,
তুমি ইউসুফ নয়নে তোমার
কেনান সমান প্রতি মিশর ।।

*

আনো বিশ্বাস পরাজিত জন
কুদরতী হাত তুমি খোদার !
হে গাফেল ! যদি আনো বিশ্বাস
পদানত তুমি রবে না আর ।।

*

ব্যক্তির প্রাণ সমাজ সঙ্গ
আর কিছুতেই নয় !
সিন্ধু-বক্ষে বাঁচে তরঙ্গ
আর কিছুতেই নয় ।।

*

সব হৃদয়ের ঐক্য-সূত্রে
সমাজ-দেহের এ পরিচয়,
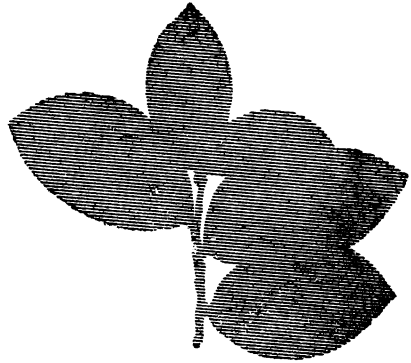
একটি আলোর শিখা নিয়ে জ্বলে
এ সিনাই চির জ্যোতির্ময় ।।

*

একটি কথার গ্রন্থি হারায়ে
গুমরে কবিতা অর্থহীন,
যে সবুজ পাতা হারায় প্রশাখা,
হারায় সে তার ফাগুন দিন ।।

*

সত্য ন্যায়ের সবক নে ফের,
নে সবক তুই বীরত্বের,
তোরে দিয়ে কাজ হবে রে আবার
সারা দুনিয়ার ইমামতের ।।

*

সৃষ্টির আদি যুগ থেকে আছে চালু
এই পদ্ধতি, এই রীতি পুরাতন,
নবীর দীপ্ত প্রদীপ শিখার সাথে
আবু লাহাবের দ্বন্দ্ব চিরন্তন ।।

*

যে নর খঞ্জর ধরে আল্লা ছাড়া অপরের তরে,
তার দর্পী তলওয়ার বিদ্ধ হয় চির দিন নিজের পঞ্জরে ।।

*
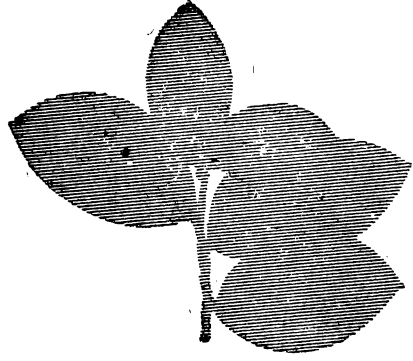
যেদিন বিচ্ছিন্ন হ'ল ধর্ম আর রাষ্ট্র একে একে ;
লালসার আধিপত্য দেখা দিল সেই দিন থেকে ।।

*

বাদশাহী বিক্রম আর পরিহাস এ গণতন্ত্রের,
বিচ্ছিন্ন যখন ধর্ম রাজনীতি থেকে
অবশিষ্ট থাকে শুধু নীতি চেঙ্গিজের ।।

*

ব্যক্তি ও সমাজ যদি যুক্ত হয় খুলে যায় রহ্‌মতের দ্বার,
সমাজ সান্নিধ্যে পায় ব্যক্তির মানস চির মূল্য পূর্ণতার,
সমাজের সাথে রাখো সখ্যতা, সংগ্রামী হও ; হও মুক্তপ্রাণ ;
মহান নবীর কথা মনে রেখ ঃ দলত্যাগী সে যে শয়তান ।।

*

মানুষের সেবা শুধু নেতৃত্বের মূলতত্ত্ব
মোদের জীবন পদ্ধতির,
ফারুকের ইনসাফ সহজ, সরল আর
নির্বিলাস জীবন আলীর !
সাচ্চা দিল মুস্‌লিম নিল এই পৃথিবীতে নেতৃত্ব যখন ;
ঐশ্বর্য, শক্তির মাঝে নিল বেছে নির্বিলাস ফকীরী জীবন ।।

*

মুস্তফার মুহব্বত অমূল্য পাথেয় যার জীবন পথের
পর্ণ আধিপত্য তার প্রসারিত জলেস্থলে এই জাহানের ।।
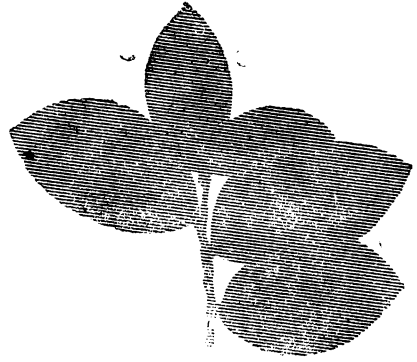
স্বাধীন তিমির মত বাস কর অন্তহীন সমুদ্র সলিলে।
যে নর সত্তাকে তার মুক্ত করে সীমানার কারাগৃহ থেকে
ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ভেঙ্গে চিত্ত তার মুক্তি পায়
আদিগন্ত আকাশের নীলে ॥

*

তারায় তারায় গ্রহে সিতারায় র'য়েছে বিশ্ব ছড়ানো
সঞ্চরমান প্রজ্ঞার চোখে নতুন আকাশ জড়ানো।
দৃষ্টি যখন ফেরায়েছি আমি মোর আত্মার পাথারে ;
দেখেছি তখন আছে সুগোপন সিন্ধু আমারি মাঝারে।

*

লাভ লোকসান হিসাব ছাড়ায়ে
বেঁচে থাকা জানি সেইতো জীবন,
কভু রাখা প্রাণ, কভু দেওয়া প্রাণ
জানি জানি আমি এইতো জীবন ॥

*

মর্দে মোমেন—ঈমানদারের
নিশানি জানাই, শোন ;
মরণ লগ্নে হাসি ছাড়া মুখে
চিহ্ন রবে না কোন ॥

*

আসবে সুরের হারানো রেশ, হয়তো সে আর আসবে না,
হেজাজ হাওয়া আসবে অশেষ, হয়তো সে আর আসবে না,
সীমান্তে আজ প'ড়ল এসে এই ফকীরের দিনগুলি ;
আসবে নতুন ধ্যানী এ দেশ ; হয়তো সে আর আসবে না ॥
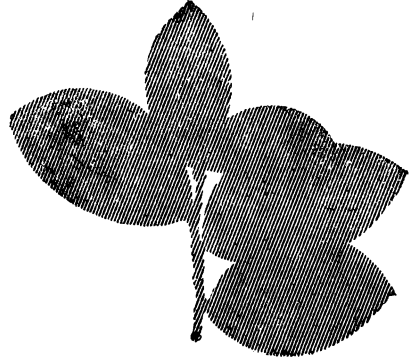
পাহাড় ও কাঠবিড়ালি

কাঠবিড়ালির কাছে পাহাড় বল্‌ল বিজন ময়দানে,
"পারিস্‌নে তুই ম'রতে ডুবে ভরা দীঘির মাঝখানে ?
একটুখানি জিনিষ তবু অহঙ্কারের ভাব দেখি,
বল্‌ব কি আর সামান্য জ্ঞান, সব-ই ফাঁকা ; সব মেকি।
নগণ্য যা পাচ্ছে কদর এখন খোদার কুদরতে,
বেকুব এবং বাজে লোকের কাছেই ধরা হয় ফতে ।
কেমন ক'রে আমার সাথে হয় তুলনা মন মত,
এই দুনিয়া, জাহান সারা আমার কাছে হয় নত ;
আমার যত গুণ গরিমা ! ···কি আছে তোর সন্ধানে ?
কোথায় বিশাল পাহাড় আবার কাঠবিড়ালি কোন্‌খানে ?"

কাঠবিড়ালি বল্‌ল রেগে, "সামাল দিয়ে কও কথা,
বাজে বুলি, বুক্‌নি শোনে ;—মাথায় কারো নাই ব্যথা।
নাই বা হ'ল তোমার মত প্রকাণ্ড এই ধড়খানা,
নও তুমিও আমার মত এই কথাই যায় জানা।
পয়দা হ'ল এই জাহানে সব-ই খোদার কুদরতে,
কেউ বড় আর কেউ ছোট ভাই, সবই খোদার হিকমতে।
বিরাট বপু ক'রে ধরায় তোমায় গ'ড়ে দেন যিনি,
হাল্কা দেহে গাছে চড়ার শক্তি আবার দেন তিনি।
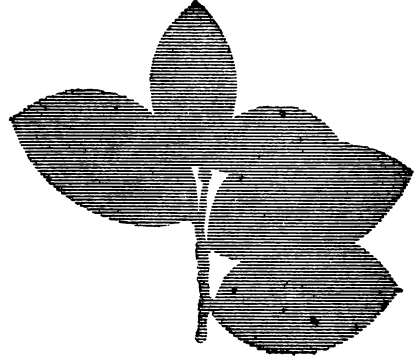
এক পা চলার নাইতো মুরোদ, তাকত কিছু নাই কাছে,
ব্যর্থ বড়াই করা ছাড়া আর কি তোমার গুণ আছে ?
হও যদি ভাই বড় তুমি চল আমার পথ ধ'রে,
এক রত্তি সুপুরিটা ভাঙো দেখি জোর ক'রে।
এই দুনিয়ার ম'ফিল মাঝে অকেজো নয় তাই কিছু ;
আল্লা পাকের কারখানাতে খারাব ব'লে নাই কিছু।"
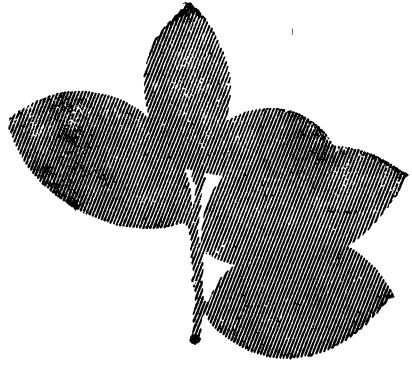
দোওয়া

আমার মনের সাধ যা কিছু
দোওয়ার মত ফুট্‌ছে জানি,
চিরাগ যেমন তেমনি যেন
হয় খোদা, মোর জিন্দেগানি।
এই দুনিয়ার আঁধার যেন
দূর হয়ে যায় আমায় দেখে,
রোশ্‌নি যেন পায় সকলে
আমার আলোক-রশ্মি থেকে।
সুন্দর হয় আমার বাঁচায়
যেন আবার এই জাহান,
ফোটা ফুলের শোভায় যেমন
হাসে সোনার গুলিস্তান।
পতঙ্গ হয় যেমন, খোদা!
তেম্‌নি কর আজ আমারে,
ভালবাসি যেন আমি
মুক্ত জ্ঞানের দীপ শিখারে।
জীবন আমার করে যেন
দুঃস্থ জনে সমর্থন,
দুঃখী এবং বৃদ্ধ জয়ীফ
যেন আমার হয় আপন।
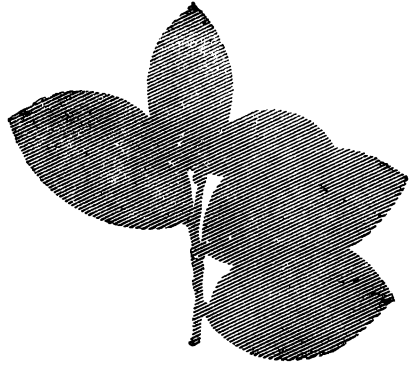
আল্লা মালিক ! প্রভু আমার
বাঁচাও পাপের কলুষ থেকে,
চালাও আমায় সেই পথে,—যার
লিখন শুধু পুণ্য লেখে ।।

পরিশিষ্ট

ইকবাল-চর্চা

একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-কবি হিসাবে আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত ; তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের রূপকার, মহৎ মানবতাবাদী কবি হিসাবে স্বদেশে-বিদেশে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর রচনার অন্তর্গত বাণীর আবেদন ছাড়াও, রূপের ঐশ্বর্য এবং শিল্প-সাফল্যও ইকবালকে এই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেয়। স্বদেশের বিভিন্ন ভাষায় যেমন, তেমনি আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায়ও ইকবালের কবিতার, কাব্যগ্রন্থের এবং দার্শনিক-চিন্তামূলক প্রবন্ধাদির অনুবাদ হয়েছে। এই অনুবাদের তালিকা যেমন দীর্ঘ, তেমনি অনুবাদকের সংখ্যাও স্বল্প নয়। ইকবাল-কাব্যের অনুবাদকদের মধ্যেও অনেকেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাষায় ইকবালের রচনা ব্যাপকভাবে অনূদিত হলেও এ-সম্পর্কে আমরা খুব বেশী অবহিত নই ; কয়েক বছর আগে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় তরুণ কুমার ভাদুরীর লেখা 'মরু-প্রান্তর' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক রচনায় ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ইকবালের রচনার অনুবাদ ছাড়াও প্রাচ্যের এই মহাকবির অন্যান্য রচনাও যে ব্যাপকভাবে পঠিত ও অনূদিত হচ্ছে, ইকবাল-চর্চায় অনেক খ্যাতনামা লেখক, গবেষক-পণ্ডিত তাঁদের শ্রম ও অভিনিবেশ নিয়োজিত করেছেন, তা বিভিন্ন তথ্য থেকেই জানা যায়।

আফগানিস্তান, ইরান প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশ ছাড়াও, মধ্যপ্রাচ্যের এবং আরব জাহানের অন্যান্য দেশেও ইকবালের রচনা অনূদিত হয়েছে, এবং ইকবাল-চর্চা চলে আসছে বহুকাল থেকেই। উর্দু, ফারসী, ইংরেজী— এই তিন ভাষায়ই ইকবাল কাব্য রচনা করেছেন, যদিও তাঁর দার্শনিক রচনাবলী প্রধানত: ইংরেজীতেই লেখা। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, ইকবালের 'পায়ামে মাশ্‌রিক' কাব্যগ্রন্থটি আফগানিস্তানের বাদশাহ্ আমানুল্লাহর নামে কবি উৎসর্গ করেছিলেন। আফগানিস্তান ভ্রমণ ও

কাবুলে অবস্থানের অভিজ্ঞতা ইকবাল লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'পরিব্রাজক' শীর্ষক কবিতায়। প্রাচ্যের এই দার্শনিক মহাকবিকে কাবুলের সুধীমণ্ডলী ও সারস্বত সমাজ আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করেন। জীবদ্দশায়ই ইকবাল এই প্রতিবেশী দেশের স্বীকৃতি, সম্মান ও শ্রদ্ধা কুড়ান। সরদার সালাহউদ্দীন সেলজুকি ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সেকালেই ইকবালের কবিতা ও জীবনদর্শন সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন, এবং সে-সব গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়।

ইরানে ইকবাল-চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয় ত্রিশের দশকের শেষ দিকে ; প্রখ্যাত ফারসী কবি বাহার খোরাসানী ইরানে ইকবালকে পরিচিত করার ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত সমালোচনা-মূলক গ্রন্থ 'সচক নিনাসী'তে ইকবাল-কাব্যের আলোচনায় একটি অধ্যায়ই ব্যয় করেন। এ-ছাড়াও একটি দীর্ঘ কবিতায় কবি বাহার ইকবালের প্রতি নিবেদন করেন তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। পরবর্তীকালে ইরানে ইকবাল-চর্চা ব্যাপকতা পায় এবং এই দার্শনিক কবির কাব্য ও জীবন-দর্শন সম্পর্কে রচিত হয় প্রচুর প্রবন্ধ, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ডঃ মুজতবা মিনাবীর 'ইকবাল লাহোরী' শীর্ষক গ্রন্থটি এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইকবাল উর্দু ও ফারসী—এই উভয় ভাষায়ই কবিতা রচনা করেছেন ; তবে অনেকের মতে ফারসী ভাষায় রচিত ইকবালের কবিতাবলীই উৎকৃষ্টতর। এর মূলে ফারসী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব এবং কাব্য-ঐতিহ্য কতটা কাজ করেছে, বিশেষজ্ঞরাই তা বলতে পারবেন। তবে, ফারসী যেহেতু উপমহাদেশের বাইরেও প্রচলিত, এবং ইরান দেশের জনগণের ভাষা, সে-কারণেও সম্ভবতঃ ইকবাল ফারসী ভাষায় কাব্য রচনা করে থাকবেন। হয়তো কবির মনে এই বাসনাও সংগোপন ছিল যে, তাঁর বাণী ও কাব্য-শিল্পের আবেদন আন্তর্জাতিক দুনিয়ায়ও ছড়িয়ে পড়ুক। ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম রেনেসাঁর রূপকার, এবং স্বদেশ ও স্বজাতির নবজাগরণের বাণী-বাহক হলেও ইকবাল ছিলেন মূলতঃ মানবতাবাদী কবি, তাঁর বাণী এবং কাব্য-শিল্পের আবেদনও তাই বিশ্ব-মানবতার কাছেই। এই প্রেক্ষিতে যথার্থই বলা হয়েছে যে,

'It is true that Iqbal himself wanted his poetry to reach wide a circle of humanity as was possible, and that was

one of the many reasons why he took to writing in Persian. When a scholar asked Iqbal is to why he started writing Poetry in Parsian in preference to urdu his reply was very significant. Iqbal said: "Because I would not write in Arabic, so I took to Persian." At that time little did Iqbal know that his works will reach the Arabic-speaking world through excellent translations which would possess all the glory and majesty of the Original." (Introduction to Iqbal, S-A-Vahid)

অনুবাদের মাধ্যমেই ইকবাল স্বদেশে-বিদেশে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছেন, শুধু প্রাচ্যে নয়, পাশ্চাত্ত্য জগতেও ইকবালের কবিতা ও অন্যান্য রচনা অনূদিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। আরবী ভাষায় ইকবালের রচনাবলী অনূদিত হওয়ার ফলে তিনি আরব জাহানে বিশেষ খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেন। ইকবালের 'তারানা-ই-মিল্লী', 'শিকোয়া ও জওয়াব-ই-শিকোয়া', 'পায়ামে মাশরিক', 'জরবী-কলিম', 'আসরার ও রমুজ' প্রভৃতি কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আরবী ভাষায় ইকবাল-কাব্যের অনুবাদে এবং ইকবাল-সাহিত্যের মূল্যায়নে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলেন মিশরীয় কবি সায়িদী আলী সাবলান, ইরাকী কবি আমিনা নুরুদ্দীন, ডক্টর আবদুল ওয়াহাব আজম। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসীর অধ্যাপক, ডক্টর ওয়াহাব আজম একাধারে কবি, ভাষাতত্ত্ববিদ ও সুপণ্ডিত। শুধু ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ এবং মূল্যায়নেই নয়, আরব জাহানে প্রাচ্যের এই দার্শনিক কবিকে ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তুরস্কেও কবি ইকবালের ব্যাপক পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তা আছে; তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর বহু রচনা এবং একাধিক কাব্যগ্রন্থ। ডক্টর আলী গাঞ্জেলী অনূদিত 'পায়ামে মাশ্‌রিক'-এর কথা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইকবালের রচনার অনুবাদ ছাড়াও এই কবি সম্পর্কিত সমালোচনামূলক রচনাও প্রকাশিত হয়েছে তুর্কী ভাষায়। ইন্দোনেশিয়ায়ও ইকবাল-কাব্য অনূদিত হয়েছে বহুকাল আগেই।

বাহরাম রাংহুতি অনূদিত ইকবালের কবিতা—বিশেষ করে 'আসরার-ই-খুদী'র অনুবাদ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ইকবালের রচনা ছাড়াও, ইকবাল-সম্পর্কিত আলোচনাও অনেক প্রকাশিত হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন ভাষায় ইকবাল-কাব্যের ও তাঁর অন্যান্য রচনার অনুবাদ শুরু হয় এই শতকের দ্বিতীয় দশকের দিকেই। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর এ, আর নিকলসনকৃত 'আসরার-ই-খুদী'র অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। ইকবালের পরামর্শক্রমে, এই অনুবাদের পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় পরবর্তীকালে। ডক্টর নিকলসন সুপণ্ডিত ও অনুবাদক হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। তাঁর এই অনুবাদকর্ম আন্তর্জাতিক দুনিয়ায়—বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্যে ইকবালের পরিচিতি ও খ্যাতির প্রসারে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। 'আসরার-ই-খুদী'র অনুবাদ ছাড়াও, নিকলসন ইকবালের অনেক খণ্ড-কবিতারও অনুবাদ করেন, এবং ইকবালের কবিতা ও জীবন-দর্শন সম্পর্কে রচনা করেন বহু মূল্যবান প্রবন্ধ। ইকবাল-কাব্যের আরেকজন প্রখ্যাত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনুবাদক হলেন অধ্যাপক এ, জে, আরবেরী। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্ম হলো 'পায়ামে মাশ্‌রিক', 'জবুর-ই-আজম' ও 'রমুজ-ই-বেখুদী'।

ইংরেজী ছাড়াও, রুশ, জার্মান এবং ফরাসী ভাষায়ও ইকবালের কবিতা, কাব্যগ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অনূদিত হয়েছে। আরলেনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেল জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন ইকবালের 'পায়ামে মাশ্‌রিক'। ইকবাল-কাব্যের আরেকজন প্রখ্যাত অনুবাদক ও সমালোচক হলেন অধ্যাপক অ্যানিমেরী শিমেল। তিনি ইকবালের কবিতা, দর্শন ও অবদান সম্পর্কে অনেক গবেষণাধর্মী, তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইকবাল-চর্চায় তাঁর শ্রম ও অভিনিবেশ, এবং পাণ্ডিত্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্যারিসের মাদাম ইভা মেরুবিচ ফরাসী ভাষায় ইকবালের Reconstruction of Religious 'Thought in Islam' (ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন') গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্ম হলো ইকবালের Development of Metaphysics in

Persia গ্রন্থটির ফরাসী-রূপান্তর। মূল থেকে ইকবালের রচনার অনুবাদের উদ্দেশ্যে ইভা মেরুবিচ ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং সম্ভবতঃ তিনি 'জবুর-ই-আজম' কাব্যগ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদও করেন। যতদূর জানা যায়, ইটালীতেই ইকবাল সর্বাধিক জনপ্রিয়। এবং ইটালী ভাষায় তাঁর বহু রচনাও অনূদিত হয়েছে। ইকবালের 'জাবিদনামা' কাব্যগ্রন্থের অনুবাদক এবং ইকবাল-সম্পর্কিত বহু মূল্যবান প্রবন্ধের রচয়িতা অধ্যাপক আলেসান্দ্রো বসানিও ইকবালকে ইটালীতে পরিচিত করার ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকবাল-চর্চা শুরু হয়েছে দীর্ঘকাল আগেই। এ-ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন অধ্যাপক এফ. এস সি-নর্থ্রূস।

উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায়ও ইকবালের রচনা ব্যাপকভাবে অনূদিত হয়েছে; এসব অনুবাদের অনেকগুলিই মূল থেকে এবং অনুবাদকেরাও স্ব-স্ব ভাষার খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক-পণ্ডিত। ইকবালের রচনার অনুবাদ ছাড়াও, ইকবাল-সম্পর্কিত গ্রন্থও কম প্রকাশিত হয়নি। ইংরেজী, উর্দু, বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায়ও গত অর্ধশতকে রচিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। বাংলাভাষায় ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ এবং ইকবাল-চর্চার পটভূমি এই গ্রন্থের ভূমিকাতেই তুলে ধরা হয়েছে।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্